জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মুখপত্র

বুলেটিন নং ৩৩ ◆ বর্ষ ১২ ◆ মহালছড়ি সাম্প্রদায়িক হামলা সংখ্যা ◆ সেপ্টেম্বর ২০০৩

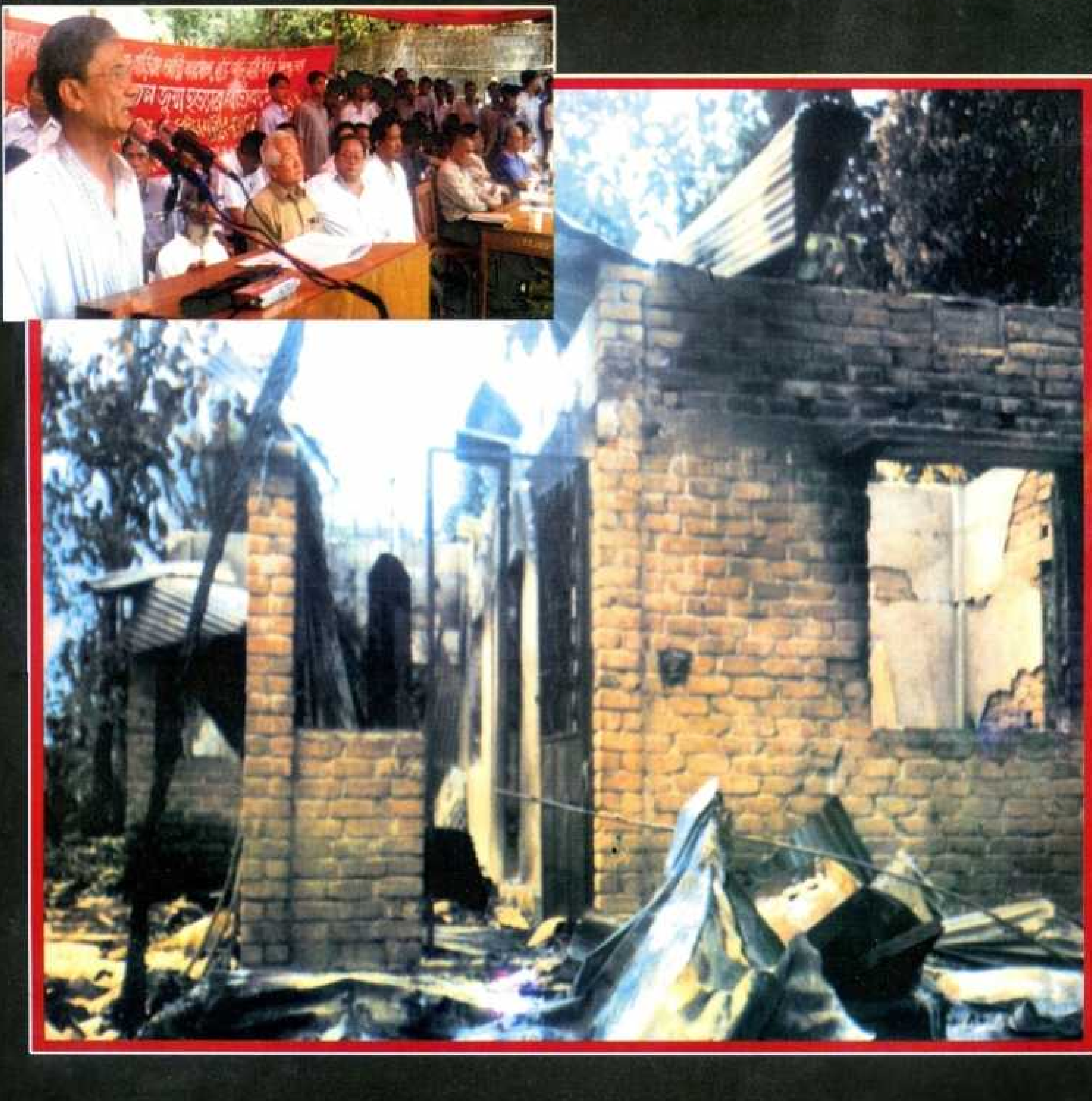

সম্পাদকীয়

মহালছড়ির সবুজ শান্ত পাহাড়ী গ্রামগুলো এখন বিবর্ণ, নিঃস্তব্দ। জুম্মরা অসহায়, অভুক্ত, অসুস্থ আর নিরাপত্তাহীনতায় চরম ভয়ার্ত। ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া তাদের জীবনে যোগ করেছে নতুন সংকট। সেটেলার বাঙালীরা ভাষায় প্রকাশের অযোগ্য বর্বরতা ও সহিংসতার দ্বারা মানবিকতার চরম বিপর্যয় ঘটিয়েছে এখানে। সেনাবাহিনীর ইন্ধন, ওয়াদুদ ভূঁইয়ার ষড়যন্ত্র ও ইউপিডিএফ-এর সন্ত্রাসের সাথে সেটেলার বাঙালীদের বীভৎস অগ্নি উৎসবে সর্বশান্ত হয়েছে জুম্ম জনগণ। ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না এই বিভীষিকাময় তান্ডবের বিবরণ দেবার। স্থানীয় প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের প্রতি জুম্ম জনগণের যেটুকু বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা ছিল তাও আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। রাত নামলে তাদের মনে ঘিরে ধরে অজানা আশংকা। সিংহভাগ লোকজন ভিটেমাটিতে ফিরতে পারছে না, নিজেদের জীবিকার্জনের সমস্ত পথ হয়ে গেছে রুদ্ধ। যারা ফিরেছে তারা উন্মুক্ত আকাশের নীচে মানবেতর দিন কাটাচ্ছে।

২৬ আগষ্ট ২০০৩ তারিখে খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলায় ৫টি মৌজার ১৪টি জুম্ম গ্রামের সাড়ে তিন শতাধিক ঘরবাড়ী সেটেলার বাঙালীরা স্থানীয় সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে সম্পূর্ণরূপে লুটপাট করার পর অগ্নিসংযোগ করেছে। খুন করেছে ২ জন শিশু-বৃদ্ধকে। ধর্ষণ করেছে ১০ জন জুম্ম নারীকে। ধারালো অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা আহত করেছে আরও অনেককে। মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে জুম্মদের। এই সাম্প্রদায়িক হামলার সময়ে খাগড়াছড়ি জেলার এমপি আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, ব্রিগেড কমান্ডার ও মহালছড়ি জোন কমান্ডারের উপস্থিতিতে এই নারকীয় ও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যারা বাস্তবায়ন চায় না এবং যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক শাসনের সুবাদে হত্যা, ধর্ষণ, অপহরণ ও ভূমি বেদখলের মতো মানবাধিকার লংঘনের ঘটনায় জড়িত তারা সরকারের একটি বিশেষ মহলের সহযোগিতা ও মদতে এই ঘটনা ঘটিয়েছে।

ইউপিডিএফ মহালছড়িতে সেনাবাহিনীর মদতে বাজার সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহতভাবে চাঁদাবাজি, খুন ও অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করে চলছিল। এনিয়ে স্থানীয় বাঙালী ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষের সঞ্চার হচ্ছিল- আর এটাই চাচ্ছিল সেনাবাহিনী। যাতে তাদের ক্ষোভ ও অসন্তোষকে সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত করা যায়। ২৪ আগস্ট ২০০৩ সেনাবাহিনীর সোর্স রূপন মহাজনকে ইউপিডিএফ অপহরণ করে সেই ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢেলে দেয়। এই মোক্ষম সুযোগকে কাজে লাগাতে সেটেলার বাঙালীদেরকে সাম্প্রদায়িক হামলায় ব্যবহার করে সেনাবাহিনী। ক্ষতিগ্রস্তদের রিপোর্টে জানা যায় যে, প্রথমে সেনাবাহিনী শুণ্যে গুলী ছুঁড়ে জুম্মদের আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে তারপর বাঙালীরা বাড়ীঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে সবকিছু শেষ করে দেয়। ফলে মহালছড়ির জুম্মরা এখন অর্থনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ অসহায় ও পঙ্গু। তারা আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে নিজেদের বাস্তুভিটা হতে উৎখাত হয়ে পড়েছে আর সেটেলাররা এসব জায়গাজমি বেদখলের জন্য তীর্থের কাকের মতো বসে আছে। মূলত: পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ করার জন্য বিশেষ মহল কর্তৃক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্যই এই ঘটনার ষড়যন্ত্র চালানো হয়েছে।

বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী সরকার, তার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্লিপ্ত রয়েছে এই ট্রাজেডীর দৃষ্টান্তমূলক বিচার ও শাস্তি বিধানে। সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী বহাল তবিয়তে প্রশাসনের নাকের ডগায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত ও মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত জুম্মরা পুলিশের হয়রানির শিকার হচ্ছে। ত্রাণ লাভ বা নিজের বাড়ীঘরে ফেরা তো দূরের কথা তারা ভয়ে পলাতক জীবনে বাধ্য হচ্ছেন। ত্রাণ বিতরণের জন্য যে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মহালছড়ি গেছে তাদের হেনস্থা করা হয়েছে।

তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন করা, অনতিবিলম্বে অপারেশন উত্তরণসহ সকল অস্থায়ী সেনা, আনসার, এপিবি ও ভিডিপি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা, ভূমি বিরোধ নিস্পত্তিকল্পে ভূমি কমিশন কার্যকর করা এবং ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের চুক্তি মোতাবেক পুনর্বাসন প্রদান করা এবং পুনর্বাসন না দেওয়া পর্যন্ত তাদের রেশন প্রদান অব্যাহত রাখার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে সমস্যা সমাধানের রাজনৈতিক পথ সচল রাখতে হবে। তাছাড়া চুক্তিবিরোধী সন্ত্রাসী ইউপিডিএফ'কে নিষিদ্ধ করতে হবে।

তাই আমাদের দাবী হলো- মহালছড়িতে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা ও এর রিপোর্ট প্রকাশ করা; হামলায় জড়িত দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা; মহালছড়িতে সংঘটিত ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ প্রতিটি পরিবারকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান ও পুনর্বাসনসহ পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করা। তাছাড়া জয়সেন কার্বারী পাড়া, চংড়াছড়ি ও পাকুজ্যাছড়িসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য এলাকার সেটেলার বাঙালীদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী, সাম্প্রদায়িক, দুর্নীতিগ্রস্ত ও মহালছড়ি ঘটনার অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী সংসদ সদস্য আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণ করা। উল্লেখ্য যে, রামগড়, দীঘিনালাসহ এধরণের অন্ততঃ অর্ধ ডজনের মতো ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিত্তোর সময়ে সেটেলার বাঙালীরা সংঘটিত করেছে।

মহালছড়ির সহিংস ঘটনা

আমরা কোন যুগে, কোন দেশে বসবাস করছি?

সজীব চাকমা

এক.

কোন দাগী অপরাধী বা কোন দুস্কৃতিকারী কিংবা অবিবেচক কেউ যদি কেবল সংকীর্ণ স্বার্থে অন্যায়ভাবে কারো অধিকার খর্ব করে বা কারো উপর আঘাত হানে এবং এতদুদ্দেশ্যে সমাজে ত্রাস সৃষ্টি করে তখন সেটাকে সাধারণভাবে এক কথায় বলা হয় সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ। সারা বাংলাদেশে বিশেষ করে শহরে-বন্দরে, পাড়া-মহল্লা বা গলির বিভিন্ন সন্ত্রাসীদের কর্তৃক চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, নারী ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, জোরপূর্বক ভূমি বা সম্পত্তি বেদখল, হত্যাকান্ড, হত্যার হুমকি ইত্যাদি সন্ত্রাসী কার্যকলাপের ঘটনা নিত্যদিনের খবর। আর সাধারণভাবে এই সন্ত্রাস দমনের জন্য এবং সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও আইনের শাসন বজায় রাখার জন্য রয়েছে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিশ বাহিনী। এমনকি এই সন্ত্রাস যখন ব্যাপক আকার ধারণ করে, সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় তখন দেশের নিরাপত্তা রক্ষাকারী সেনাবাহিনী এবং বিডিআরও দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসে। বর্তমান সরকারও শুরু থেকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কথা বলে আসছে এবং দেশের ব্যাপক সন্ত্রাস দমনের জন্য ইতিমধ্যে পুলিশ, বিডিআর ও সেনাবাহিনী দিয়ে 'অপারেশন ক্লীনহার্ট' নামে সন্ত্রাসবিরোধী যৌথ অভিযানও চালিয়েছে। এতে সন্ত্রাস যেমনি কিছুটা প্রশমিত হয় তেমনি এই যৌথবাহিনী কর্তৃক অন্যায় কাজও সংঘটিত হয়। এখনও বিভিন্ন সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এই যৌথ অভিযানের খবর পাওয়া যায়।

কিন্তু এই যৌথ বাহিনীর আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী পুলিশ যখন চোখের সামনে একদল উচ্ছৃঙ্খল লোক কর্তৃক মহালছড়িতে আদিবাসী জুম্মদের শত শত ঘরবাড়ী ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে জ্বালিয়ে দিতে দেখেও চুপ করে থাকে, অন্যায়কারীদের বাধা দেয় না তখন সেই পুলিশকে আমরা কিভাবে বিবেচনা করবো? তারা কি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী হিসেবে বিবেচিত হবেন নাকি আইন-শৃঙ্খলা লংঘনকারী হিসেবে পরিগণিত হবেন? 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে'র ন্যায় তৎস্থলে যারা দায়িত্বে ছিলেন তারা কি এই জঘন্য হামলার অপরাধে অপরাধী নয়? গ্রামের পর গ্রাম ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে জুম্ম বাড়ীতে অগ্নিসংযোগকারী শত শত সেটেলার বাঙালীর একজনও কি সেদিন তারা গ্রেফতার করতে পেরেছিলেন? আর দেশ রক্ষা ও জনগণের সেবায় নিয়োজিত এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার যে সেনাবাহিনী সেই সেনাবাহিনীর সদস্যরা যদি মহালছড়িতে জুম্ম গ্রামে হামলাকারী, লুটপাটকারী, অগ্নিসংযোগকারী ও নারী ধর্ষণকারীদের প্রতিরোধ বা আটক না করে বরং তাদেরকে মদদ দেয়, উস্কানী দেয়, সহযোগিতা করে এবং নিজেরাও অংশগ্রহণ করে তখন তাদেরকে আমরা কি হিসেবে চিহ্নিত করবো? নিরপরাধ জুম্মদের রক্ষা না করে উল্টো সেই সেনারা যদি জুম্ম গ্রামে হামলাকারী সেটেলারদের কর্তৃক জুম্ম বাড়ীতে অগ্নিসংযোগের জন্য কেরোসিন ও দিয়াশলাই যোগান দেয় তখন কোন বিচারে সেই সেনাদের সত্যিকারের শান্তি ও দেশ রক্ষাকারী এবং সন্ত্রাস বিরোধী বলে অভিহিত করবো? বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিদিন যে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটছে অথবা পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায়ই যে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটছে তার চেয়ে শতগুণ জঘন্য, নৃশংস ও বর্বরোচিত হয়েছে এই মহালছড়ির হামলার ঘটনা। এটা নিখাদ সন্ত্রাসী ঘটনাতো বটেই বরং এটা তার চেয়েও ন্যাক্কারজনক। অন্যান্য সন্ত্রাসী ঘটনাগুলো কেবল সংকীর্ণ স্বার্থের কারণেই এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সংঘটিত হয়। কিন্তু এখানে রয়েছে জাতিগত বিদ্বেষ, হিংসা, হিংস্রতা, জিঘাংসা, উন্মত্ততা, পাশবিকতা এবং মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও মানবতাবিরোধী নির্বোধ সাম্প্রদায়িকতা।

এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে ঢাকা-চট্টগ্রাম বা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে মহালছড়ি ঘটনার মত কোন ঘটনা কি এই মুহূর্তে কল্পনা করা যায়? সেখানে পাহাড়ী কেন, একদল সেটেলার বাঙালীও যদি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে গিয়ে একযোগে তিন/চারশ' বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে জ্বালিয়ে দেয় তখন কেমন হবে অবস্থা অথবা তা কি সম্ভব? সাধারণ বাঙালীর কথা বাদ, প্রকাশ্যে একদল পুলিশ বা সেনা সদস্যও যদি একদল বাঙালী নিয়ে গিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম বা অন্য কোন বাঙালী এলাকার শত শত ঘর-বাড়ী ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য কেরোসিন বা দিয়াশলাই যোগান দিত তখন কি এই বাংলাদেশ, এই সরকার, এই পুলিশ বা এই সেনাবাহিনী এই অবস্থায় থাকত? তখন নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের চেহারাও বদলে যেত। কিন্তু মহালছড়ির ঘটনাটি পার্বত্য চট্টগ্রামে ঘটেছে বলে, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের উপর এই হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, হত্যা ও ধর্ষণ সংঘটিত হয়েছে বলেই কি হামলায় প্রত্যক্ষ সহযোগী সেনা সদস্য ও পুলিশদের কিছু হয়নি? একই কারণেই কি হামলায় মূল মন্ত্রণাদাতা চরম সাম্প্রদায়িক আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া এমপি এখন আবার উল্টো পাহাড়ীদেরকে হেনস্থামূলক নানা অপতৎপরতা চালাতে পারছেন এবং হামলার দিন দুস্কৃতিকারী কোন সেটেলার বাঙালীই গ্রেফতার হয়নি?

দুই.

১৯৭১ সালের ৮ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রামের পানছড়ি-দীঘিনালা-বড়মেরুং এবং ১৯ ডিসেম্বর পানছড়ির কালানালে জুম্মদের উপর যে গণহত্যা সংঘটিত হয় তখন ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময়কাল, সারাদেশে যুদ্ধ পরিস্থিতি, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ পরিস্থিতি। এমন সময়ে অনেক দুর্ঘটনা, অন্যায় আক্রমন ঘটতেই পারে। ১৯৭৯ সাল থেকে নেতিবাচক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অত্যন্ত অন্যায় ও অবৈধভাবে যে হাজার হাজার বাঙালি পরিবার এনে জুম্মদের জায়গা-জমি বেদখল করা ও বসতি স্থাপন শুরু হয় এবং সেনাবাহিনী, ভিডিপি ও অনুপ্রবেশকারী বাঙালিদের দ্বারা ১৯৮০ সালের ২৫ মার্চ কাউখালীর কলমপতিতে, ১৯৮১ সালের ২৫ জুন মাটিরাঙ্গা-বেলছড়িতে, ১৯৮৪ সালের ৩১ মে বরকলের ভূষণছড়া-হরিণাতে, ১৯৮৬ সালের ১ মে পানছড়ি-মাটিরাঙ্গা-খাগড়াছড়িতে, ১৮ মে মাটিরাঙ্গার রামবাবুঢেবাতে, ১৯ ডিসেম্বর দীঘিনালার চংড়াছড়িতে, ১৯৮৮ সালের ৮ আগষ্ট বাঘাইছড়িতে এবং ১৯৮৯ সালের ৪ মে লংগদুতে যে নৃশংস গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ ও ভূমি বেদখল সংঘটিত হয় সেই সময়কালে সারা দেশটাই ছিল অনেকটা অস্থিতিশীল, সামরিক শাসনে শাসিত এবং গণতন্ত্র ছিল কল্পনাবিলাস মাত্র। দেশে তখনো তথ্য প্রযুক্তির যেমন বিকাশ ঘটেনি তেমনি বাক স্বাধীনতা ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ছিল অনেকটাই ভূলুণ্ঠিত। বিশেষ করে জনসংহতি সমিতির গেরিলাযুদ্ধ দমনের ছুতোয় পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুয়ের বাঁচা-মরা থেকে শুরু করে সবকিছুই তখন নিয়ন্ত্রিত হতো সেনাবাহিনীর দ্বারা। পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন স্থানে নির্বিচারে মানুষ মারা হলেও, হত্যাকান্ড ঘটানো হলেও এবং শত শত ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়া হলেও অন্য স্থানের মানুষ তা সহজেই জানতে পারত না। দেশ-বিদেশের বিবেকবান মানুষের জানাতো দুরের কথা! তাই সেই সময়ের সেসব ঘটনা অবিশ্বাস্যভাবে নৃশংস হলেও সম্ভবপর হয়েছিল।

সারাদেশে দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৯৯০ সালে সামরিক স্বৈরশাসক এরশাদের পতন ঘটলে দেশে সার্বিকভাবে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসে। সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমের ব্যাপক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। মানুষের বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা অনেকটা প্রসারিত হয়। দেশে বিবেকবান মানুষের তৎপরতাও বেশ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তারপরও পার্বত্য চট্টগ্রামে একাধিক নৃশংস গণহত্যা সংঘটিত হয়। ১৯৯২ সালের ২ ফেব্রুয়ারী লংগদুর মাল্যা গণহত্যা, ১০ এপ্রিল লোগাং গণহত্যা, ২০ মে খোদ রাঙামাটি সদরেই সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা এবং এরপরে ১৯৯৩ সালের ১৭ নভেম্বর নানিয়ারচরের গণহত্যার কথা সবার জানা। আরও অন্যান্য অনেক ঘটনা-দুর্ঘটনার কথা বাদই দিলাম।

লেমুছড়ির অসহায় লোকজন

আসলে সামরিক শাসকের অবসান হলেও তখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো সামরিক কর্মকর্তাদের দ্বারা। জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখাও (শান্তিবাহিনী) ছিলো। তখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান হয়নি, এই অঞ্চলের আদিবাসী জুম্মদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য সংগ্রামকারী পার্টি জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের বোঝাপড়া হয়নি। তাই গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সেই সময়ের সরকার ও বিরোধী দলসমূহ পার্বত্য সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে সমাধানের কথা বলা শুরু করলেও মৌলিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি তখন পর্যন্ত একটা অনিশ্চিত অবস্থায় ছিল।

কিন্তু ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা বাস্তব অর্থে একটা সমাধানের পথে, শান্তির পথে অগ্রসর হয়। জনসংহতি সমিতি তার এক সময়ের দাবী প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এর দাবীর ব্যাপারে অনেকটা নমনীয় হয়ে কেবল জাতিগত অস্তিত্ব রক্ষা ও মৌলিক অধিকারের ন্যূনতম স্বীকৃতি স্বরূপ চুক্তি সম্পাদনে সম্মত হয়। জনসংহতি সমিতির অস্ত্র জমাদান ও বিলুপ্তি ঘোষণার মধ্য দিয়ে জনসংহতি সমিতি তার দুই দশকের অধিক কালব্যাপী পরিচালিত সশস্ত্র সংগ্রামের পথ পরিহার করে এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্দোলন ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের ঘোষণা দেয়। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি ও গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে জনসংহতি সমিতি ও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণের এই পদক্ষেপ ইতিবাচক দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু আন্দোলনকারী শক্তি জনসংহতি সমিতি আনুষ্ঠানিকভাবে সমঝোতায় এসেছে এবং চুক্তি অনুসারে তার পালনীয় শর্ত সম্পাদন করেছে সেহেতু চুক্তি অনুসারে সরকারও যদি তার শর্ত পালন করে তাহলে পার্বত্য সমস্যা সমাধানের পথে, শান্তির পথে যে এগিয়ে যাবে তা নিশ্চিতভাবেই মানুষ আশা করেছিল। আর যারা বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে চুক্তির প্রাক্কালে ও পরে চুক্তির বিরোধীতা করে চুক্তি বাস্তবায়ন হলে নিশ্চিতভাবেই তাদেরও ভুল ভেঙে যেতো। কিন্তু সরকারসমূহ চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেনি। উপরন্তু নানাভাবে চুক্তি লংঘনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যে কারণে জুম্মরা তাদের বেদখলকৃত জায়গা-জমি এখনও ফেরত পায়নি, দীর্ঘদিন ধরে মানবেতর জীবনযাপনকারী ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীরা যথাযথভাবে পুনর্বাসিত হয়নি, পরিস্থিতির কারণে বাস্তুচ্যুত হাজার হাজার আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুরা এখনও ক্ষতিপূরণ পায়নি এবং নিজের বাস্তুভিটায় যেতে পারেনি। যে কারণে অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অনেক রক্তের বিনিময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম ও স্থায়ী বসতি বাঙালীদের অধিকারের স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, জুম্ম শরণার্থী পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্কফোর্স ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা গঠিত হলেও তা ভালোভাবে কাজ করতে পারছে না। উপরন্তু প্রধানমন্ত্রী নিজ দপ্তরে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা কুক্ষিগত রেখে একে আরো খর্ব করা হয়েছে এবং বিধি বহির্ভূতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে একজন বাঙালীকে নিয়োগ দিয়ে জুম্মস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপ চালানো হচ্ছে।

তিন.

এই অবস্থায় সাধারণ জুম্মদের উপর এত বড় জাতিগত, সাম্প্রদায়িক ও নগ্ন হামলা কোনমতেই মেনে নেয়া যায় না। এটাতো একেবারে কাটা গায়ে নুনের ছিটার মত, মড়ার উপর খারার ঘা এর মত। ঘটনা ঘটার আগে কোন জুম্ম বা মানবতাবাদী বা শান্তি কামী কোন বাঙালীও বোধ হয় ভাবতে পারেনি যে পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনও এমন পাশবিক ও মধ্যযুগীয় ঘটনা ঘটতে পারে। তাই প্রশ্ন জাগে, আসলে আমরা কোন যুগে কোন দেশে বসবাস করছি? পার্বত্য চট্টগ্রাম কি আসলেই বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ? অবিচ্ছেদ্য অংশ হলে এখানে এমন বর্বর এবং বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে কেন? আবার যুক্তি দেখানো হচ্ছে- ইউপিডিএফ এর চাঁদাবাজি এবং সন্ত্রাসী ইউপিডিএফ কর্তৃক রূপন মহাজন নামের এক বাঙালীকে অপহরণের জের হিসেবেই এই ঘটনা ঘটেছে এবং বাবুপাড়া অভিমুখী মিছিলকারী বাঙালীদের উপর সশস্ত্র ইউপিডিএফ সদস্যদের গুলী বর্ষনের ফলেই বাঙালীরা উত্তেজিত হয়ে পাহাড়ীদের উপর এই হামলা করেছে। কোন কোন মহল আবার সাধারণভাবে জুম্মদেরকে জব্দ করার উদ্দেশ্যে বলছে যে, উপজাতীয় সন্ত্রাসীদের অব্যাহত চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসের জন্য এমন ঘটনা ঘটেছে। কোন কোন পত্রিকায়ও এভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো জুম্মরা যতই ক্ষতিগ্রস্ত হোক না কেন তাদের দোষেই এটা ঘটেছে অথবা জুম্মদের উপর আক্রমণ হয়েছে বেশ হয়েছে-এই মতটাকে প্রতিষ্ঠিত করা। সচেতনভাবেই হোক অসচেতনভাবেই হোক এই ধরণের চিন্তাধারায় বর্ণবাদী, সাম্প্রদায়িক ও জুম্ম বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী এবং হামলাকারীদের মনোভাবই প্রকাশ পায়। এই ধরণের বিচার-বিশ্লেষণ মোটেও সুবিবেচনাপ্রসূত নয়। কেননা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও তো প্রতিদিন কোন না কোন সন্ত্রাসী কাউকে না কাউকে হত্যা করছে, অপহরণ করছে অথবা মুক্তিপণ দাবী ও আদায় করছে। সেক্ষেত্রে তো সেই এলাকার অন্যান্য সাধারণ মানুষের শত শত ঘরবাড়ী কেউ জ্বালিয়ে দিচ্ছেনা, লুটপাট করছে না, তাদের মা-বোনদের ধর্ষণ করছেনা! আর সন্ত্রাসী তো সন্ত্রাসীই; সে তো কোন জাত-পাত বোঝে না। ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা রূপন মহাজনকে অপহরণ করেছে, এই রূপনকে উদ্ধার করা ও সন্ত্রাসীদের ধরার দায়িত্বতো পুলিশের। না হলে সেখানে বসে বসে পুলিশ জনগণের দেয়া ট্যাক্সে বেতন খাচ্ছে কেন? সেটা না করে সাধারণ জুম্মদের শত শত ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়া, লুটপাট করা আর নারী ধর্ষণ করার যুক্তি তারা কোন কেতাবে, কোন সংবিধানে বা আইনে খুঁজে পেয়েছে? এই ঘটনার সত্যিকারের বিচার করতে গেলে রূপন মহাজনকে অপহরণকারী সন্ত্রাসীদের যেমনি বিচার করতে হবে, যেমনি জুম্ম গ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলাকারী সেটেলারদের বিচার করতে হবে, তেমনি সাম্প্রদায়িক হামলাকারীদের মদদদাতা, উস্কানীদাতা ও ষড়যন্ত্রকারীদের বিচার করতে হবে।

চার.

আসলে সব কথার শেষ কথা হচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের সরকার ও শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে এমন একটা মহল আছে যারা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে বিলুপ্ত করতে চায় অথবা পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে উচ্ছেদ করতে চায় এবং তাদের জায়গা-জমি, অধিকার সবকিছু কেড়ে নিতে চায় অথবা নানা ষড়যন্ত্র করে, দুর্বল করে, দ্বিধাবিভক্ত করে জুম্মদের মানুষ হিসেবে আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন জাতি হিসেবে বিকশিত হওয়ার প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করে দিয়ে জুম্মদেরকে ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করতে চায়। তাদের এই আকাঙ্খা এবং পরিকল্পনা অত্যন্ত জঘন্য এবং বিভীষিকাময়। নানা রূপে নানা ঢঙে এই মহলের সদস্যরা সরকারীদলে বা বিরোধী রাজনৈতিক দলে যেমনি রয়েছে, তেমনি রয়েছে সেনাবাহিনী, পুলিশবাহিনী, বিডিআর ইত্যাদি বাহিনীতে, রয়েছে বিভিন্ন অফিস-আদালতে ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অবস্থানে। এই গোষ্ঠীটিই বাংলাদেশের মূল্যবান বর্তমানকে যেমনি, তেমনি তার সুন্দর সোনালী ভবিষ্যতকেও কুরে কুরে খাচ্ছে। আর সবকিছুর আগে সহজ ভেবে সুযোগ বুঝে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জাতির উপর দিয়ে তার হীণ উদ্দেশ্য ও প্রতিক্রিয়াশীলতা চরিতার্থ করতে চায়। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় দুনিয়ার সবকিছুই পরিবর্তনশীল, কোনকিছুই স্থায়ী নয় এবং মানবসভ্যতা সর্বদা বিকাশশীল এবং প্রগতিমুখী। জোর-জবরদস্তি করে অন্যায় করে কিছু সময়ের জন্য বা একটা দীর্ঘ সময়ের জন্য হয়ত কাউকে পরাস্ত করা যায়, কাউকে দমন করা যায় বা তথাকথিত বিজয়ী হওয়া যায় বা এজন্য কিছু বাহ্বা পাওয়া যায় কিন্তু ইতিহাস ও সভ্যতার চুড়ান্ত বিচারে তারা ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হতে বাধ্য। ইতিহাসের অনেক বীরের দম্ভ, অনেক রাজা-মহারাজার দাপট এখন আর কেউ পাত্তাই দেয় না। তাদের বিশাল বিশাল সাম্রাজ্য কবেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে! কিন্তু যারা কেবল নিজের শ্রেণী বা গোষ্ঠীর সংকীর্ণ স্বার্থে নয় গোটা মানবজাতির জন্য মানুষের প্রগতি ও মানবতার জন্য একটি বাক্যও উচ্চারণ করে গেছেন সেটাই দিনে দিনে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। ইতিহাসে মানবতা ও মানুষের প্রগতিকে ধারণ না করায় এই যুগে যে যতই প্রতাপশালী হোক না কেন বা তার অস্তিত্বকে যতই চিরস্থায়ী মনে করা হোক না কেন পরবর্তী পর্যায়ে তার ক্ষয় বা অবলুপ্তি অনিবার্য। অপরদিকে মানবতা ও মানুষের প্রগতিকে ধারণ করায় ইতিহাসের অনেক দুর্বলতর বা নগণ্য শক্তি, শ্রেণী, গোষ্ঠী, পরিবার, প্রজন্ম বা বংশধরও পরবর্তীকালে ইতিহাস, সমাজ ও সভ্যতার নিয়ামক হয়ে উঠেছেন। আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জুম্ম জাতিকেও সংখ্যালঘু, দুর্বল, অনগ্রসর ভেবে বা তাদেরকে মানুষ পদবাচ্য মনে না করে যে গোষ্ঠীটি কেবল কোন না কোনভাবে কেবল দমন-পীড়ন, শোষন-বঞ্চনা বা যাচ্ছেতাইভাবে ব্যবহার করতে চায় সেই গোষ্ঠীটির ভবিষ্যৎ কখনো উজ্জ্বল হতে পারেনা। সেই গোষ্ঠীটি নিজেদের বিদ্যমান শক্তির ব্যাপারে যতই আত্মবিশ্বাসী হোক না কেন তার স্থান ইতিহাসের আস্তাকুড়ে, কারন সে ক্ষয়িষ্ণু ও প্রতিক্রিয়াশীল। অপরদিকে জুম্মদের অধিকার ও জুম্মদের আন্দোলন ন্যায্য এবং প্রগতিমুখী, তাই তাদের বিকাশের তাৎপর্য অপরিসীম, অপরিহার্য এবং অনিবার্য। এভাবে নাহলে অন্যভাবে অথবা কোন না কোনভাবে জুম্মদের অধিকার আদায় হবেই এবং বিকাশ হবেই।

যারা সত্যিকার অর্থে দেশের ও মানুষের শুভ চায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের শুভ চায় এবং যারা নিজেদের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে মনে করেন আমরা আশা করি তারা সরকারে থাকুন বা বিরোধী দলে থাকুন, সেনাবাহিনীতে থাকুন বা পুলিশ বাহিনীতে থাকুন অথবা অন্যকোন অবস্থানে থাকুন তারা অবশ্যই অবিলম্বে সেই অশুভ শক্তির জাল ছিন্ন করবেন। নির্দ্বিধায় জুম্মদের ন্যায্য অধিকারের স্বীকৃতি দেবেন এবং চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবেন। রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুলের মত অনেক মহৎ মানুষের জন্মদাতা এই বাঙালী জাতির উত্তরাধিকার হিসেবে এবং মানবতাবোধসম্পন্ন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার, রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনায় বিভিন্ন দায়িত্ব যারা পালন করছেন আশাকরি তারা আর নিজের জাতির এবং মানুষ হিসেবে নিজের আর খুব বেশী দিন অপমান করবেন না। তাই তাদের প্রতি আমাদের সবিনয় আহ্বান সংখ্যালঘু জুম্ম জাতি ও তাদের অধিকারের আন্দোলনকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তুলে না ধরে তাদের ন্যায্য অধিকারের স্বীকৃতি দিন, চুক্তি বাস্তবায়ন করুন, জুম্ম জনগণ ও জুম্ম জনগণের অধিকারের জন্য আন্দোলনকারী শক্তি জনসংহতি সমিতিকে শক্তি যোগান তাহলেই পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের জন্য সত্যিকারের শক্তি যোগাবে, বাংলাদেশের ভূখন্ড হিসেবে সুরক্ষিত থাকবে এবং সন্ত্রাসমুক্ত হবে।

মহালছড়ি ঃ সিনথিসিস পর্বের ট্রাজেডী

তনয় দেওয়ান

২৬ আগস্ট ২০০৩ মহালছড়িতে জুম্মদের উপর যে সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটলো তা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। তেমনি কোন বিচ্ছিন্ন কিছু নয় ২৪ আগস্ট রূপন মহাজন নামের একজন বাঙালী ইউপিডিএফ কর্তৃক অপহৃত হবার ঘটনা। দুটি ঘটনাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিত্তোর সময়ে একটি বিশেষ মহলের ষড়যন্ত্র ও মদতে ঘটে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী পুঁজিবাদী শাসক শোষকদের শাসন শোষণের প্রয়োজনে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প পূর্ব হতে যেভাবে লালন পালন ও পরিপুষ্ট করা হচ্ছিল তারই ফলশ্রুতি হলো মহালছড়ির ঘটনা। ইতিহাসের আলোকে সূত্রবদ্ধ করলে আমরা তা স্পষ্ট করে বুঝতে পারবো।

১৯৭১ সালে বাঙালী জাতীয়তাবাদের মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। কিন্তু এ স্বাধীনতা কেবলমাত্র বাঙালীদের জন্য বয়ে আনলো মুক্তির স্বাদ আর যারা বাঙালী নয় তাদের জন্য চরম হুমকী হয়ে দেখা দিল। বাঙালী জাতীয়তাবাদের উগ্রতা ও সম্প্রসারণ এবং ইসলামিক মৌলবাদের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জুম্ম জাতির জন্য 'বাঙালী' কথাটি আতঙ্ক বৈ কিছু হলো না। তাই এই স্বাধীন দেশের সংবিধান প্রণয়ণের সময়ে জুম্ম জনগণ ও মেহনতি মানুষের মুক্তির সোনালী সূর্য এম এন লারমা গণপরিষদে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন- 'বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণের সঙ্গে আমরাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সব দিক দিয়ে আমরা একসঙ্গে একযোগে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা। আমার বাপ, দাদা, চৌদ্দ পুরুষ- কেউ বলেন নাই- আমি বাঙালী।'

বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে বাঙালী জাতীয়তাবাদ যেভাবে জাতিগত পরিচয়ের প্রশ্নে বিভাজন সৃষ্টি করলো বা বাঙালী জাতীয়তাবাদ Thesis এর উপর দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠিত হলো তা বাস্তব কারণে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হলো। এই বাঙালী জাতির উগ্র রূপ তথা থিসিসকে যান্ত্রিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রয়োগ যে এন্টি থিসিস সৃষ্টি করলো তাতে সেই ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সৃষ্ট বর্বরতাকেও হার মানিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে ভরিয়ে তোলা হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের আকাশ বাতাস। আর 'Anti-Thesis' হলো জুম্ম জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক জনসংহতি সমিতির জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন। যেটাকে নেদারল্যান্ডের লেখক উইলিয়াম ভান সেন্ডেল যথার্থই বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রতি চ্যালেঞ্জিং শব্দ হিসেবে অভিহিত করেছেন। বাংলাদেশ যে কেবলমাত্র মুসলমান বাঙালীদের দেশ নয় একথাটি শাসকগোষ্ঠী আজও অনুধাবণ করতে পারছে না। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় বাংলাদেশের শাসকদের মনোভাব বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও পাকিস্তানী ঔপনিবেশিকতাবাদের চাইতেও বেশী মারাত্মক ও বর্বর।

জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে যে থিসিস তার মূল লক্ষ্য হলো ভূমি বেদখল করা আর এন্টি-থিসিস এর মূল কর্তব্য হলো নিজেদের ভূমি রক্ষা করা। কেননা পার্বত্য চট্টগ্রামে চাষযোগ্য ও বাগান করার উপযোগী ভূমির পরিমাণ খুব কম। তার পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থার অনুন্নয়নের কারণে কিছু জমি বাসযোগ্য হলেও চাষের ফলে লাভযোগ্য নয়। তাই সড়ক বা জলপথে যাতায়াত উপযোগী ভূমির উপর লোলুপ দৃষ্টি বাঙালী শাসকদের মধ্যে সর্বদা দেখা গেছে। ফলে ভূমির জন্য এখানে সংগঠিত করা হচ্ছে একের পর এক দাঙ্গা এবং গণহত্যার মতো অমানবিক মধ্যযুগীয় বর্বরতা।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সবকিছুই বাঙালী জাতি বা বাংলাদেশের সাথে ভিন্ন। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সেই ভিন্নতাকে ঐক্যে রূপান্তরের চেষ্টা না করে বরং আরও তীব্রভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। এই এলাকা যে যুগ যুগ ধরে স্বাধীন ছিল, বৃটিশ আমলে শাসন বহির্ভূত এলাকা ছিল, পাকিস্তান আমলে উপজাতীয় এলাকা ছিল তা উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদী শাসকগোষ্ঠী কখনো স্বীকার করেনি। পদদলিত করতে চেয়েছে নানাভাবে। তার একটি সহজ পন্থা ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংখ্যাগত ভারসাম্যের পরিবর্তন আনা। সে জন্য ইসলাম ধর্মকে হাতিয়ার করা হলো। লাখ লাখ মুসলমান বাঙালী অনুপ্রবেশ ঘটানো হলো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায়। তাই স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত জুম্ম জনগণের মনকে ছুঁয়ে যেতে পারলো না। জুম্ম শহীদরা স্থান পেল না শহীদ মিনারের ফুলের সৌরভে। লাল সবুজের জাতীয় পতাকায় জুম্মদের রক্ত বৃথা গেল। নতুন করে রক্ত দিয়ে ইতিহাস লিখতে বাধ্য হলো জুম্ম জনগণ। আর এতেই চলেছে এন্টি থিসিস পর্বে জুম্ম জনগণের উপর চরম মানবাধিকার লংঘনের পর্ব।

বাঙালী শাসক গোষ্ঠীরা তাদের শাসন শোষণের প্রয়োজনে নানান শ্লোগান দিয়েছে। একসময়ে এরশাদের আমলে শ্লোগান দেয়া হলো- 'পাহাড়ী বাঙালী ভাই ভাই, আমরা সবাই শান্তি চাই।' এ শান্তির শ্লোগান ছিল ৯ দফার আলোকে জেলা পরিষদ গঠন করার জন্য জনমতকে বিভ্রান্ত করার শ্লোগান। এরশাদের বিদায়ের পর খালেদা জিয়ার বিএনপি ক্ষমতায় এসে একদিকে আলোচনা

অন্যদিকে গণহত্যার পথ বেছে নিল। জনসংহতি সমিতির ও সেনাবাহিনীর মধ্যেকার সশস্ত্র সংঘাতকে সাধারণের কাছে ছড়িয়ে দিতে সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দিল। এবার তারা শ্লোগান ধরলো- 'একটা দুইটা পাহাড়ী ধরো, ধরে ধরে নাস্তা করো।' সে সাথে আরও শ্লোগান দিল- 'পাহাড় জঙ্গল ঘেরাও কর, শান্তিবাহিনী খতম করো।' তারা খতম করতে পারেনি কিন্তু জুম্ম খতম করার নীতি থেকে কেহ সরে দাঁড়ালো না। তবে ক্ষমতার মসনদ থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হলো গণবিচ্ছিন্ন নির্বাচন করার পর। পরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলো। আলোচনা হলো, চুক্তি হলো। বলা যায় থিসিস আর এন্টি থিসিসের ফল সিনথিসিস হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

মহালছড়ি সাম্প্রদায়িক হামলায় পুড়ে যাওয়া বাড়ী

সিনথিসিস পর্বে উত্তরণে জুম্ম জনগণকে অনেক রক্ত আর ত্যাগের পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। জুম্ম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার পথে চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতীয় অঞ্চলের মর্যাদায় আবার আসীন করার মাধ্যমে সিনথিসিস পর্ব শুরু হলো। কিন্তু এই সিনথিসিস পর্ব পার্বত্য চট্টগ্রামে কি পর্যায়ে রয়েছে? ভূমি বেদখল, বাঙালী অনুপ্রবেশ, সেনাশাসন ও ইসলামীকরণের বিরুদ্ধে জুম্মজনগণের ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, জুম্ম জাতীয়তাবাদ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে যে জাতীয় ও জন্মভূমির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম চললো তার একটি নতুন রূপ দেখা দেয় ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে। মূলত: দুটি দ্বান্দ্বিক শক্তির একটি ভারসাম্য অবস্থায় এই চুক্তি। আর চুক্তির সবশেষ কথা হলো একটি অসম শক্তির সাথে দুর্বল শক্তির যুদ্ধে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য একটি ঐতিহাসিক কালপর্ব। এই পর্বেও দ্বন্দ্ব সংঘাতের অবসান হয় না। বরং নতুনভাবে বৃহৎ শক্তি দুর্বল শক্তিকে চাইবে নিশ্চিহ্ন করতে, বিভক্ত করতে, বিলীন করে দিতে। সেজন্য আমরা দেখতে পাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিত্তোর সময়েও মহালছড়ির মতো এধরনের কমপক্ষে অর্ধ ডজনের মতো সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটেছে। গড়ে উঠেছে সেনা মদতপুষ্ট ইউপিডিএফ। আর সিনথিসিস পর্বে শাসকগোষ্ঠী তার সেনাবাহিনীকে সরাসরি জুম্ম জনগণ ও জনসংহতি সমিতির উপর লেলিয়ে দিতে পারলো না। তার পরিবর্তে মাঠে নামালো ইউপিডিএফ ও সেটেলার বাঙালীদের। যে দ্বন্দ্ব ছিল জুম্ম জাতীয়তাবাদের সাথে উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদের তা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য ইউপিডিএফ শুরু করলো চুক্তির সাথে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের দ্বন্দ্ব - যা একটা বৈরী দ্বন্দ্বে রূপ লাভ করে। আর এই দ্বন্দ্বকে ঘিরে সেনাবাহিনী তার ষড়যন্ত্রের জাল প্রসারিত করলো। ইউপিডিএফকে জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে কাজ করার ঠিকাদারী দিল আর সেটেলার বাঙালীরা পেল 'শক্তি যার, জমি তার' নামের মধ্যযুগীয় বর্বর নীতি বাস্তবায়নের লাইসেন্স।

সঙ্গত কারণে ইউপিডিএফ এর প্রধান কাজ হলো জেএসএস সদস্যদের খুন করা, অপহরণ করা আর জনসাধারণকে জিম্মি করে তাদের উপর চাঁদাবাজি করা। সে সুযোগে সেটেলার বাঙালীদের প্রধান কাজ হলো জুম্মদের ভূমি বেদখল করা, গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ করা আর তার জন্য সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো। আর এই সাম্প্রদায়িক হামলাতো বিনা কারণে করা যায় না। যে কোনভাবে একটি ছুতো বের করতে হয়। তাই ইউপিডিএফকেই উৎস সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করছে সেনাবাহিনী। এই সরল কথাটির জটিল ও মর্মান্তিক ফসল হলো সাম্প্রতিক কালের মহালছড়ির ঘটনা।

এই মহালছড়ি এলাকাটি বিভিন্নভাবে বিগত সময়ে আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। বিশেষ করে ইউপিডিএফ কর্তৃক তিন বিদেশী অপহৃত হবার পর সরকার ও ইউএনডিপির যৌথভাবে গঠিত ঝুঁকি নিরূপণ মিশনের রিপোর্টে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মহালছড়ি উপজেলাকে সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে গত বছরে। তখন কারা ঝুঁকির কারণ তা বলা হয়নি বা কারা ঝুঁকিতে রয়েছে তারও উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু গত ২৬ আগস্টের ঘটনা প্রমাণ করলো যে, সেটেলার বাঙালীরাই ঝুঁকির কারণ এবং জুম্মরাই ঝুঁকিতে রয়েছেন। পরে খোদ খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক বললো- পাহাড়িরা অসহায় আর আমি নিরুপায়।

২৬ আগস্টের সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনাটি ঘটে ২৪ আগস্ট ইউপিডিএফ কর্তৃক অপহৃত হওয়া মহালছড়ি বাজারের রূপন মহাজন অপহৃত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। অপহৃত রূপন মহাজন ছিল সেনাবাহিনীর সোর্স। তার অন্য একটি রাজনৈতিক পরিচয়ও ছিল। সে ছিল যুবলীগের কর্মী। কাজেই উভয় কারণে প্রচন্ড দাপটে সে মহালছড়িতে ব্যবসা চালাতো আর কাউকে কেয়ার করতো না। অন্যদিকে ইউপিডিএফ'র কাছে মহালছড়ি বাজার ছিল চাঁদা আদায়ের এক মহা উৎস। দীর্ঘদিন ধরে তারা এখানে চাঁদাবাজি করে খাগড়াছড়ি জেলা ও নানিয়ারচর এলাকা জুড়ে তাদের সন্ত্রাসী কাজ চালাত। তাই একটি দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক চলছিল উভয়ের মধ্যে। কিন্তু সেনাবাহিনী সেই সম্পর্কে অভিভাবকের ভূমিকা নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিকে ব্যবহার করত। তার সূত্র ধরে যখন ইউপিডিএফ চাঁদার জন্য রূপন মহাজনকে ধরলো তখন রূপন মহাজন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো। তাই সে সেনাবাহিনীর সাপোর্ট নিয়ে তার ব্যবসা চালাতে লাগলো। আর ইউপিডিএফও রূপন মহাজনের দৌড়ের খবর জানতো। তাই তারা সহজেই টাকা আয়ের জন্য তাকে অপহরণ করলো। এতেই মোক্ষম সুযোগ হলো সেনাবাহিনীর। তারা বলির পাঁঠা করলো রূপন মহাজনকে আর সাম্প্রদায়িকতা ও দুর্ভাগ্যের আগুনে নিক্ষেপ করলো সাধারণ জুম্মদের। পরিশেষে ইউপিডিএফ বহাল তবিয়তে রইলো সন্ত্রাসের রাজত্বে।

মহালছড়িবাসীর দূর্ভাগ্য যে, সেনাবাহিনীর এই চাওয়া পূরণের জন্য খোদ বাবুপাড়ায় ঘাঁটি গেড়ে ইউপিডিএফ এই কাজগুলো করছিল। সাধারণ জুম্ম জনগণ হয় জিম্মি হয়ে পড়েছিল নতুবা তথাকথিত নিরপেক্ষতা ও চাকুরীজীবির দোহাই দিয়ে এসব সন্ত্রাসীদের স্থান দিয়েছিল। কিন্তু তাদের অপরিণামদর্শীতা ও সন্ত্রাসের কারণে তাদের জীবনে যে ভয়াবহ দিন ঘনিয়ে আসছিল তা তারা বুঝেও বুঝে উঠতে পারেনি। পরিণামে আগুনের লেলিহান শিখার চাইতেও বীভৎস রূপে সেটেলারদের লোলুপতা কেড়ে নিল তাদের সবকিছু।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিত্তোর সময়ে মহালছড়িতে জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক তৎপরতা ইউপিডিএফের সন্ত্রাসের কারণে স্থিমিত হয়ে পড়েছিল। আমরা তখন থেকে আশংকা করছিলাম যে, এই এলাকায় জনসংহতি সমিতির রাজনৈতিক নেতৃত্বের অনুপস্থিতিতে প্রশাসন ও সেনাবাহিনী সেটেলার বাঙালীদের লেলিয়ে দিতে পারে। বিশেষ করে জুম্মদের দুই শতাধিক একর জমি বেদখল করে পাকুজ্যাছড়িতে গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ করে তারা তার মহড়াও দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, বিগত সময়ে রামগড়ে এধরণের দাঙ্গার ঘটনা ঘটিয়েছিল। দীঘিনালাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব ও কার্যকলাপ সুদৃঢ় ছিল বলে সেনাবাহিনী দীঘিনালাতে সফল হতে পারেনি। মহালছড়িতে তারা সফল হতে পেরেছে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণে। আর এটা চাচ্ছে সেনাবাহিনী সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে। যখন জনসংহতি সমিতি দুর্বল হয়ে পড়বে বা বিলুপ্ত হবে তখন ইচ্ছেমত ভূমি বেদখল করবে, দাঙ্গা ঘটাবে, জুম্মদের নিশ্চিহ্ন করবে। এটা সাধারণ জুম্ম জনগণকে বুঝে নিতে হবে কেবলমাত্র দুর্যোগের দিনে নয়; প্রতিদিনকার জীবনে।

অপহরণ ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রামে হরহামেশা ইউপিডিএফ কর্তৃক ঘটছে। বিগত ২০০১ সালে তিন বিদেশী অপহরণ ঘটনা নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। স্পষ্ট হয়েছিল শাসক দল, সেনাবাহিনী ও ইউপিডিএফ এর মুখোশ। এখন আমরা যদি বাংলাদেশের সমতল জেলাগুলোর কথা ধরি বা খোদ রাজধানীর কথা ধরি তাহলে সেখানেও দেখি যে, সন্ত্রাস ও অপহরণের ঘটনা প্রতিদিন ঘটছে। সেসব ঘটনায় মামলা হচ্ছে, তদন্ত হচ্ছে এবং বিচার হচ্ছে। কিছুদিন আগে চট্টগ্রামে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জামাল উদ্দিনকে সন্ত্রাসীরা অপহরণ করেছে। কিন্তু সেখানে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে বা বাঙালী সন্ত্রাসীরা তাকে অপহরণ করেছে এধরণের কথা শোনা যায়নি। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন অপহরণ ঘটনা ঘটলে তা ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে আর এই প্রচারের টার্গেট হচ্ছে উপজাতীয় সন্ত্রাসী নাম দিয়ে গোটা জুম্ম জাতি। এখানে প্রশাসন, প্রচার মিডিয়া জাতিগত বিদ্বেষ নিয়ে কাজ পরিচালনা করছে আর

অপহরণকারী ইউপিডিএফ এর নাম চাপা দিচ্ছে। ফলে সাম্প্রদায়িক মনোভাব জাগানো হচ্ছে সাধারণ জুম্মদের বিরুদ্ধে। যে কারণে মহালছড়িতে রূপন মহাজনের অপহরণের ঘটনাটিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপ দেয়া হয়েছে।

অপহরণ ঘটনার প্রতিবাদ হবে- তা স্বাভাবিক। কিন্তু খোদ প্রশাসনের নাকের ডগায় যদি মাইকে ঘোষণা করা হয়- প্রশাসন আমাদের পক্ষে, পুলিশ আর্মী আমাদের পক্ষে। তাই যার যা কিছু আছে তা নিয়ে পাহাড়ীদের উপর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হও। আর নারায়ে তকবীর, আল্লাহু আকবর শ্লোগান দিয়ে হামলা করলো। সবক্ষেত্রে প্রশাসন কিছুই জানেনা এমনি ভান করে রইলো। এ যেন ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিদ্যাভ্যাসের মতো। না জানি তখন মহালছড়ির টিএনও, ওসি সাহেবরা কোন অভ্যাস চরিতার্থ করছিল।

সচেতন মহল মনে করে যে, মহালছড়ির হিন্দুদের তাড়ানোর জন্য সেনাবাহিনী ইউপিডিএফকে ব্যবহার করছিল। এই ইউপিডিএফ গত বছরও হিন্দুদের দূর্গাপূজার টাকা ছিনিয়ে নিয়েছিল। তখন হিন্দুরা কোন সুবিচার পায়নি। ফলে তাদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছিল। অন্যদিকে মুসলমান ব্যবসায়ীরা হিন্দুদের কারণে একচেটিয়া ব্যবসা করতে পারছিল না। আর সেটেলাররা চাচ্ছিল তাদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ করতে। এভাবে সেনাবাহিনীর ডিজাইন অনুযায়ী ইউপিডিএফ রূপন মহাজনকে অপহরণ করে এবং তার মোক্ষম সুযোগকে কাজে লাগাতে তারা হিন্দুদেরসহ সেটেলারদের মদত দেয়। তাই হিন্দুদের চাইতে সেটেলার বাঙালীরা বেশী উৎসাহিত হয়ে দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটায়। কারণ সেটেলারদের ক্ষতির কোন কারণ ছিল না। মরলে রূপন মহাজন মরবে তাদের কোন ক্ষতি হবে না। হিন্দুরাও এভাবে জুম্মদের আস্থা আর বিশ্বাসে আঘাত হানে। ক্ষতিগ্রস্ত সিংহভাগ লোকজন বলেছে এখন তারা হিন্দু বাঙালী আর সেটেলার বাঙালী কারোর উপরই আস্থা রাখতে পারেন না। আমরা যখন মহালছড়ির ভস্মীভূত এলাকা পরিদর্শন করছিলাম তখন লোকজনের সাথে কথা বলে জানতে পারি যে, ইউপিডিএফ ২৬ তারিখ সকালে কার্তুজের গুলীতে কয়েকজন বাঙালীকে জখম করেছিল। বাঙালীরা এমনিতেই ছিল উত্তেজিত এবং জুম্মরা ছিল অসংগঠিত এমনি পরিস্থিতিতে আগুনে ঘি ঢালার কাজটি করে ইউপিডিএফ।

বাঙালী জাতীয়তাবাদের থিসিস ও জুম্ম জাতীয়তাবাদের Anti-thesis এর দ্বন্দ্বে বিএনপি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের থিসিস নিয়ে হাজির হয়। অবশ্য মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তারও আগে গোড়াতেই এই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের থিসিসকে পত্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন বাংলাদেশে। কিন্তু আওয়ামী লীগ বাঙালী জাতীয়তাবাদকে উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদে পরিণত করায় তা হতে পারেনি। তারপর বিএনপি ক্ষমতায় এসে পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় তা আরও একধাপ এগিয়ে মুসলমান বাঙালী জাতীয়তাবাদে উন্নীত করলো। এই মুসলমান বাঙালী জাতীয়তাবাদ ছিল বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের পুরো উল্টো একটা রূপ। তাই বিএনপি কখনো বাংলাদেশী হতে পারেনি। ওয়াদুদ ভূঁইয়ার মতো লোকেরা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত তো হতে পারেনি বরং বেশী বেশী মুসলমান বাঙালী হয়ে সাম্প্রদায়িকতার ককটেলে পরিণত হয়েছে।

এই Syn-thesis পর্বটি জুম্ম জনগণ তথা জনসংহতি সমিতির প্রতিকূলে নেওয়ার জন্য সৃষ্টি হলো ইউপিডিএফ। ইউপিডিএফ এর করালগ্রাসে নিমজ্জিত ছিল মহালছড়ি এলাকাটি। আর সেটেলার বাঙালীদের মোক্ষম সুযোগ এলো ওয়াদুদ ভূঁইয়ার খাগড়াছড়ির রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তনের পর। ওয়াদুদ ভূঁইয়া রামগড়ে ২০০১ সালে সাম্প্রদায়িক হামলা ঘটিয়ে তার রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তনের কথা ঘোষণা করেছিল। এই ওয়াদুদ ভূঁইয়া ১৯৯২ সালের লোগাং গণহত্যার নায়ক। লোকে তখন বলেছিল খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এলে পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন করে গণহত্যা উপহার দেবে। নানিয়ারচর গণহত্যাও তার উপহার ছিল। ২০০১ সালের নির্বাচনে জয়লাভের পর তার কিছুটা নমুনা আমরা দেখতে শুরু করেছি। এই নমুনার শেষ কি হবে তা ভবিষ্যতই বলতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নই Syn-thesis পর্বে জয়লাভের চাবিকাঠি। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে ইতিহাসের আস্ত াকুড়ে ফেলে দেবার জন্য ওয়াদুদ-প্রসিত চক্র যারপরনাই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। কাজেই আমরা যদি সিনথিসিস পর্বে জয়লাভ করতে পারি তবেই একমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জন্য থিসিস পর্ব রচনা করতে পারি। আর তার মাধ্যমেই পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আন্দোলন একটা সফল পরিণতিতে পৌঁছুতে পারে। আর এক্ষেত্রে চীন বিপ্লবের মহানায়ক মাও সেতুঙ-এর দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের পথ ছাড়া বিকল্প কোন পথ খোলা নেই আমাদের সম্মুখে। সেটা অতীতের আন্দোলনের ইতিহাস প্রমাণ দেয়; বর্তমানকে সে স্তরে উপনীত করতে পারলেই সিনথিসিস পর্ব নতুন থিসিস রচনা করতে পারবে।

জুম্ম শরণার্থীদের রেশন বন্ধ করা অমানবিক ও সাম্প্রদায়িক

সরকার ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের রেশন প্রদান বন্ধ করেছে। চার দলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিশেষ করে খাগড়াছড়ি এমপি আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার ষড়যন্ত্রে ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের রেশন বন্ধ করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। বিগত দুই বছরে জোট সরকার তা বাস্তবায়ন করার সাহস করতে না পারলেও অতি সম্প্রতি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে বলে জানা গেছে। গত ২৯ আগষ্ট ২০০৩ দৈনিক ইত্তেফাক-এ "পাহাড়ী শরণার্থীদের রেশন বন্ধ" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, "...পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পাহাড়ী শরণার্থীদের রেশন প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানায়। এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এক পত্রে জানানো হয় যে, পাহাড়ী শরণার্থীদের আর রেশন দেয়া সম্ভব নয়। বরঞ্চ এডিপি বরাদ্দ থেকে কোন উপায়ে তাদেরকে পুনর্বাসনের জন্য কোন কিছু করা যায় কিনা তা ভেবে দেখতে বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে আরো জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পাঠানো নির্দেশে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন গুচ্ছগ্রামে বসবাসরত বাঙালী অভিবাসীদের রেশন অব্যাহত রাখতে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে বলা হয়েছে, তাদের (অভিবাসী বাঙালীদের) যথাযথ পুনর্বাসনের জন্য করণীয় প্রসঙ্গে কমিটি গঠন করার।"

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে শরণার্থী নেতারা সরকারের উক্ত নির্দেশ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন। এছাড়া ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণাথীরা এবছরের জুন মাস পর্যন্ত রেশন পাওয়ার পর আর কোন রেশন পায়নি। বহিরাগত সেটেলার বাঙালীদের রেশন অব্যাহত রেখে জুম্ম শরণার্থীদের রেশন বন্ধ করা নিঃসন্দেহে অমানবিক ও সাম্প্রদায়িক পদক্ষেপ বৈ কিছু নয়। উল্লেখ্য যে, গত ১০ মে ২০০৩ স্মারক নং- পত্র সংখ্যা ২২.৫৯.১.০.০.৯৮-২০০৩-৩+৪ মোতাবেক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত এক পত্রে জানানো হয় যে - ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের রেশন অব্যাহত থাকবে।

সরকারের উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর জুম্ম শরণার্থীরা উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। তাদের অসহায়ত্ব এতে আরও তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে। ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন না হওয়া ও জমি-জমা ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত শরণার্থীদের জন্য রেশন প্রদান অব্যাহত রাখাসহ বিভিন্ন দাবীনামা জানিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে আরও একটি স্মারকলিপি প্রদান করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর আজ অবধি সরকার উল্লেখিত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের জন্য রেশন প্রদান করে আসছে। কেননা জুম্ম শরণার্থীরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেও এখনো তাদেরকে যথাযথ ও সুষ্ঠুভাবে পুনর্বাসন করা হয়নি। এখনো হাজার হাজার প্রত্যাগত শরণার্থী স্ব স্ব জায়গা-জমিতে ফেরত যেতে পারেনি। প্রত্যাগত শরণার্থীদের বসতভিটা, বাগানভিটা, চাষযোগ্য জমি, শ্মশান ভূমি, অনাথ আশ্রম, জুম মহল ও নিজস্ব মৌজার রিজার্ভের জমি ইত্যাদি ফেরত দেয়া হয়নি। মন্দির নির্মাণ, ঋণ মওকুফ, চাকুরীতে পুনর্বহাল, পুনর্বহালকৃত চাকুরীজীবিদের জ্যৈষ্ঠতা প্রদানসহ আর্থিক সুবিধাদি প্রদান, শিক্ষিত বেকারদের চাকুরী প্রদান ও জানমালের নিরাপত্তা বিধান ইত্যাদি অনেক বিষয় অবাস্তবায়িত রয়ে গেছে। ফলশ্রুতিতে এখনো ৪টি ট্রানজিট ক্যাম্পে শরণার্থীরা মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে এবং ৪০টি গ্রাম ও ৩,০৫৫ পরিবারের জায়গা-জমি সেটেলার বাঙালী ও সেনাছাউনী কর্তৃক বেদখলে রয়েছে।

উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘাতময় পরিস্থিতি চলাকালে প্রায় সত্তর হাজার জুম্ম নর-নারী নিজ নিজ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে নিরাপত্তার তাগিদে ভারতের ত্রিপুরারাজ্যে শরণার্থী হিসেবে প্রায় ১ যুগ ধরে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছিল। সরকার এবং জুম্ম শরণার্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে সম্পাদিত ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তি ও ১৬ দফা প্যাকেজ চুক্তি সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক উক্ত জুম্ম শরণার্থীরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। এছাড়া অনেকে স্ব-উদ্যোগেও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। এতদিন ধরে এসকল জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে রেশন প্রদান করা হয়ে আসছিল। এমতাবস্থায় জুম্ম শরণার্থীদের জন্য রেশন বরাদ্দ করা না হলে শরণার্থীদের সার্বিক জীবনযাত্রা আরো অধিকতর বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। অপরদিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পুনর্বাসিত সেটেলার বাঙালীদেরকে যারা বিভিন্ন গুচ্ছগ্রামে বসবাস করছে তাদের রেশন অব্যাহত রাখার, এমনকি পুনর্বাসনের জন্য কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়েছে। অথচ সেই সেটেলার বাঙালীরাই জুম্মদের ও জুম্ম শরণার্থীদের জায়গা-জমি বেদখল করে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবৈধভাবে বসবাস করছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে নানা দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। সাম্প্রতিক মহালছড়ির হামলা তার জ্বলন্ত উদাহরণ। সেটেলারদের বেদখলকৃত ভূমি থেকে প্রত্যাহার না করে এবং শরণার্থীদের স্ব স্ব জমি ফেরৎ না দিয়ে উপরন্তু সেটেলারদের পুনর্বাসনের চেষ্টা সমস্যাকে আরও জটিল করার চক্রান্ত। তাই জুম্ম শরণার্থীদের রেশন বন্ধ করা সরকারের একটি পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক পদক্ষেপ এবং এটা কখনো বাস্তবসম্মত হতে পারে না।

ডব্লিউটিও'র কানকুন সম্মেলন ও আদিবাসী প্রসঙ্গ

গত ১০-১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩ পাঁচদিন ব্যাপী মেক্সিকোর কানকুন শহরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যমন্ত্রী ও প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)-র (World Trade Organisation) ৫ম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন কম অনুন্নত দেশসমূহের ভিন্নমত পোষণের কারণে অসফলভাবে সমাপ্ত হযেছে। এই সম্মেলনে উন্নত কতকগুলি দেশের সাথে কম উন্নত দেশসমূহ (LDC- Less Development Countries) কার্যত ঝগড়ায় মেতে উঠে। তাছাড়া বিশ্বায়নের নামে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির একচেটিয়াকরণকে রুখতে বিশ্বের শত শত নিপীড়িত মানুষ প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল। দক্ষিণ কোরিয়ার এক কৃষক প্রতিবাদ করতে গিয়ে আত্মাহুতি দেন। ডব্লিউটিও'র মূল কথা হলো পুঁজি ও পণ্যের বিশ্বব্যাপী অবাধ প্রবাহ ঘটানো। কিন্তু পুঁজি ও পণ্যের সাথে শ্রমের অবাধ প্রবাহের ব্যাপারে রয়েছে চরম বাধা। তারা এখন আর শুধুমাত্র পুঁজি আর শিল্প পণ্যকে এই সংস্থার অধীনে আনতে চাচ্ছে না, এটাকে আরও সম্প্রসারিত করে কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বিনিয়োগ প্রভৃতির বিষয়েও সম্প্রসারিত করতে চাচ্ছে। এই সংস্থার দ্বিমুখী নীতির কারণে উন্নত বিশ্ব ৬% বিশ্ববাণিজ্য বৃদ্ধি করেছে। অন্যদিকে দরিদ্র দেশগুলোর বিশ্ব বাণিজ্যে চরম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী যেসকল নতুন নতুন সংস্থা গড়ে উঠেছিল তার একটি হলো গ্যাট (GATT-General Agreement on Tarif and Trade)। গ্যাটের সর্বশেষ উরুগুয়ে রাউন্ডে ডাঙ্কেল প্রস্তাবের ভিত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'মুক্ত বাণিজ্য'-এর প্রস্তাব করলে ১৯৯৪ সালে মারাকাসে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার জন্ম হয়।

কানকুনে ৫ম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীও যোগদান করেন। কানকুন সম্মেলনের জন্য ইতিমধ্যে ১৮ জুলাই ২০০৩ বিভিন্ন বিষয়ে একটি খসড়া প্রস্তুত হয়েছে। তিনি দেশের গরীব মানুষের স্বার্থের বিপক্ষে কোন মতামত দেবেন না বলেও প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বাংলাদেশ ডব্লিউটি'র কৃষি, সেবা, পরিবেশ, বিনিয়োগ ও পেটেন্ট বিষয়ে মারাকাস চুক্তিতে ১৯৯৪ সালে স্বাক্ষর করেছিল। যাতে কৃষিতে ভর্তুকি প্রদান বন্ধ করাসহ কৃষিজাত পণ্যের বিশ্বব্যাপী পেটেন্ট আইন প্রসঙ্গে সম্মতি প্রদান করা হয়েছিল। তাই অক্সফাম-জিবি'র উদ্যোগে বাংলাদেশের আদিবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণসহ বিশ্বের আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষার বিষয়ে কানকুন সম্মেলনকে উপলক্ষ্য করে দেশব্যাপী এক স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করা হয়। গত ১৯ আগষ্ট ২০০৩ রাঙামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মিলনায়তনে এ উপলক্ষে এক মতবিনিময় সভারও আয়োজন করা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, অক্সফাম-জিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর মিস শেলী ও চাকমা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায় প্রমুখ। সভায় ফেসিলিয়েটরের দায়িত্ব পালন করেন আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য রূপায়ণ দেওয়ান। মিস শেলী তার বক্তব্যে বলেন যে, বাংলাদেশের আদিবাসীদের ও গরীব মানুষের স্বার্থরক্ষার জন্য ৬ লাখ লোকের এক স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান তারা দেশব্যাপী পরিচালনা করছেন এবং জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাকে প্রথম দশজনের মধ্যে রাখা হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, বাংলাদেশের সাবেক দু'জন অর্থমন্ত্রীসহ তত্ত্বধায়ক সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা হাবিবুর রহমানও এতে স্বাক্ষর প্রদান করেছেন। পরে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা তার স্বাক্ষর প্রদান করেন। তার সাথে সাথে চাকমা রাজা দেবাশীষ রায়, আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যবৃন্দ, রাষ্ট্রপতির সাবেক সহকারী উপদেষ্টা সুবিমল দেওয়ান ও বিশিষ্ট আদিবাসী ব্যক্তিগণ স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে তাদের স্বাক্ষর প্রদান করেন।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৫ সালে ডব্লিউটিও'র প্রথম বৈঠক হয়। দ্বিতীয় বৈঠক হয় জেনেভায় ১৯৯৭ সালে। তৃতীয় বৈঠক হয় ১৯৯৯ সালে সিয়াটলে এবং ২০০১ সালের চতুর্থ বৈঠকে দোহা ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা তৈরী হয়েছিল। সিঙ্গাপুরের বৈঠকে 'সিঙ্গাপুর ইস্যুজ' নামে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর স্বার্থরক্ষার কথা বলা হয় তাতে কম অনুন্নত দেশসমূহ আরও বেশী প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে বাধ্য হবে। কেননা খোদ ইউরোপ ও আমেরিকায় শুল্কের হার কমানো হয়নি। মতভেদ সৃষ্টি হয় ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে। তারা নিজেরাই নিজেদের দেশে কৃষির উপর ভর্তুকি দিচ্ছে আবার কম অনুন্নত দেশসমূহের উপর চাপ দিচ্ছে কৃষির উপর ভর্তুকি হ্রাস ও আমদানী শুল্ক হ্রাস করার জন্যে। এর ফলে প্রধানত ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশীয় শিল্প। এখন কৃষি, সেবা, পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ের উপর যদি চুক্তি করা হয় তবে সেগুলো পণ্যে পরিণত হবে। সাধারণ মানুষের এসব ক্রয় করতে হবে। তখন তাদের কোন অধিকার থাকবে না। কৃষি প্রধান বাংলাদেশের ন্যায় কম উন্নত দেশগুলোয় যেখানে কৃষি এবং ভূমির সাথে আদিবাসীদের জীবন জীবিকা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তাতে কোটি কোটি আদিবাসীর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। কৃষির বীজ থেকে শুরু করে কৃষি ব্যবস্থার উপর কৃষকের পরিবর্তে বহুজাতিক কোম্পানীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে কৃষক মাঠ থেকে উচ্ছেদ হবে।

মূলতঃ বিশ্বব্যাপী সাধারণ মানুষের পুঁজি, পণ্য ও বিনিয়োগের অবাধ প্রবাহের বিরুদ্ধে তথা বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধই সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে। তাই বাংলাদেশের আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষায় অক্সফাম-জিবির উদ্যোগে আদিবাসীদের স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান গুরুত্বপূর্ণ ও যুগোপযোগী।

ডানিডা কর্তৃক আদিবাসীদের জন্য অধিকার ভিত্তিক কর্মসূচী

ডেনমার্ক সরকারের উন্নয়ন সংস্থা ডানিডা (DANIDA-Danish Development Agency) বাংলাদেশের আদিবাসীদের জন্য ৫ বছর মেয়াদী অধিকার ভিত্তিক কর্মসূচী (Rights based Programming for the indigenous people) প্রস্তুত করতে যাচ্ছে। এর দুটি অংশ রয়েছে। একটি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জন্য এবং অপরটি হচ্ছে সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের জন্য। এলক্ষ্যে ডানিডা গত ২৪ আগস্ট ২০০৩ রাঙামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ মিলনায়তনে একটি পরামর্শ সভা (Consultation Meeting) আয়োজন করে। এতে ডেনমার্ক দূতাবাসের 'মানবাধিকার ও সুশাসন কর্মসূচী'র সমন্বয়ক লার্স ইজকার, এনজিও কর্মী ও আঞ্চলিক পরিষদসহ জনপ্রতিনিধিসহ ৩০ জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। পরামর্শ সভায় তিনটি গ্রুপে ভাগ হয়ে আলোচনা করা হয়। একটা হচ্ছে উইমেন ইস্যু, আরেকটা হচ্ছে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং আর তৃতীয়টি হচ্ছে এডভোকেসী এন্ড লবিং।

পরামর্শ সভায় ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি, ১৯৯৮ সালের রাঙ্গামাটি ঘোষণাপত্র ও পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত বিভিন্ন আইনে বিদ্যমান অধিকারের ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া যেতে পারে বলে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত আদিবাসী জুম্ম জনগণের প্রথাগত অধিকারকেও প্রাধান্য দেয়ার জন্য সবিশেষ দাবী উঠেছে। এলক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়। সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনসহ অন্যান্য যে সকল সরকারী কর্মকর্তাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োগ করা হবে তাদেরকে মানবাধিকার, পার্বত্যাঞ্চলের বিশেষ অবস্থা, পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান আইন ও আদিবাসী জুম্ম জনগণের জীবনধারা সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। কারণ যে সকল কর্মকর্তা পার্বত্য চট্টগ্রামে আসেন তাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা তথা আদিবাসীদের অধিকার সম্পর্কীত বিষয়ে জানা না থাকার কারণে মানবাধিকার লঙ্ঘনসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা জটিল আকার ধারণ করছে বলে অভিমত এসেছে। এছাড়াও বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে বিভিন্ন পেশাজীবিকে নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত কর্মশালা আয়োজন করা দরকার বলে অভিমত উত্থাপিত হয়।

এক্ষেত্রে আদিবাসীদের প্রতি ড্যানিশ সরকারের সহায়তা সংক্রান্ত কৌশলপত্রকে অত্যাধিক পরিমাণে গুরুত্বারোপ করা হয়। ঐ কৌশলপত্রের ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়ার প্রস্তাব করা হয়। এ প্রসঙ্গে ইউএনডিপি'র কথা অনেকে উত্থাপন করেন এই মর্মে যে, ইউএনডিপি'র আদিবাসী সংক্রান্ত নীতিমালা থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পে তা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আইন অনুসারে পরিষদসমূহকে যাতে ক্ষমতার্পণ করা হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথাগত নেতৃত্ব যাতে দক্ষ হতে পারে সেলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম হাতে নেয়ার জোরালো প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পরিশেষে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য রূপায়ণ দেওয়ানের সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে পরামর্শ সভা সমাপ্তি হয়। তিনি তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আদিবাসী আন্দোলন এবং আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ড্যানিশ সরকার এযাবৎ নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা পালন করে আসছে। তারা বাংলাদেশে উন্নয়নের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে তথা উন্নয়ন কাজে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে কার্যকরভাবে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। যা অন্যান্য অনেক দাতা সংস্থা করে না। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নেও তাদের আন্তরিকতা রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে ওয়াটার সেনিটেশন-এর উপর প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ডানিডা আঞ্চলিক পরিষদকে অন্তর্ভূক্ত করেছে এবং কোপেনহেগেনে রিক্রুটিং বোর্ডের একজন সদস্য হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের একজন সদস্যকে অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

ড্যানিশ দূতাবাসের 'মানবাধিকার ও সুশাসন কর্মসূচী'র সমন্বয়ক লার্স ইজকার তাঁর বক্তব্যে জানান যে, তারা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ডানিডা'র আদিবাসীদের জন্য অধিকার ভিত্তিক কর্মসূচীতে অবশ্যই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ইস্যুটি অন্তর্ভূক্ত করবেন। উল্লেখ্য যে, ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩ ঢাকায় আরেকটি সভা হয়। যাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে রূপায়ণ দেওয়ানসহ ৩ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

মহালছড়ি ট্রাজেডী ঃ তিন কায়েমী স্বার্থের আকাঙ্ক্ষার ফসল

ইউপিডিএফ, সেনাবাহিনী ও সেটেলার - এই তিন কায়েমী স্বার্থের পরিকল্পিত আকাঙ্ক্ষার ফসল হচ্ছে মহালছড়ির ট্রাজেডী। তিন কায়েমী স্বার্থের লক্ষ্য হচ্ছে জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আপোষহীন রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে ধ্বংস করা এবং তাদের এই লক্ষ্য পরিপূরণ তখনই সম্ভব যখন পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়। কারণ এ ধরণের সাম্প্রদায়িক হামলার মাধ্যমে -

১। পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ করা যায়।
২। ইউপিডিএফ বলতে পারে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পার্বত্য সমস্যার সমাধান আনতে পারেনি, জনসংহতি সমিতি ব্যর্থ।
৩। সেনাবাহিনী যুক্তি দেখাতে পারে যে, অস্থিতিশীল পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য তাদের উপস্থিতি অবশ্যই লাগবে।
৪। এই সুযোগে সেটেলাররা জুম্মদের জায়গা-জমি অবাধে বেদখল ও গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ করতে পারে।

মোট কথা এই তিন কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে বরাবরই পারদর্শী। এসকল ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য সেনাবাহিনীর অঙ্গুলী হেলনে বহাল তবিয়তে সন্ত্রাস পরিচালনাকারী চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ ২৪ আগষ্ট ২০০৩ মহালছড়ি বাজারের রূপন মহাজনকে সিঙ্গিনালা ফুটবল মাঠ থেকে অপহরণ করে। এই অপহরণ ঘটনার জের ধরে ২৫ আগষ্ট সেটেলার বাঙালীরা বাঙালী সমন্বয় পরিষদ গঠন করে এবং ২৬ আগস্ট হামলা চালানোর সুযোগ লাভ করে। ইউপিডিএফের সশস্ত্র সদস্যদের সন্ত্রাসের সুযোগে সেনাবাহিনী সেটেলারদের মদদ দেয়। ইউপিডিএফ ও সরকারের মধ্যে সখ্যতা বজায় থাকায় তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নিয়ে স্থানীয় প্রশাসন জুম্মদের বিরুদ্ধে সেটেলারদের লেলিয়ে দেয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর এই ত্রিমুখী সমীকরণের বদৌলতে পার্বত্য চট্টগ্রামে এধরণের সহিংস ঘটনা একের পর এক ঘটে চলেছে।

সাম্প্রদায়িকতা ও ভূমি বেদখলের সহিংসতার নগ্ন রূপ

জুম্ম জনগণকে উচ্ছেদ করে তাদের ভূমি বেদখল করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করাই হচ্ছে মহালছড়ি হামলার মূল উদ্দেশ্য। মহালছড়ি এলাকায় জুম্মদের জায়গা-জমি বেদখলের জন্য দীর্ঘদিন ধরে সেনাবাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় সেটেলার বাঙালীরা চেষ্টা চালিয়ে আসছে। ইতিমধ্যে এ নিয়ে কয়েক দফা সংঘর্ষও হয়েছে - যেখানে সেনাবাহিনী বরাবরই সেটেলারদের পক্ষাবলম্বন করেছে। এক্ষেত্রে ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে এবং ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে উপজেলার পাকুজ্যাছড়ি গুচ্ছগ্রামের সেটেলাররা জয়সেন কার্বারী পাড়া এপি ব্যাটেলিয়ন ক্যাম্পের চারপাশে পর্যায়ক্রমে দুই শতাধিক ঘর-বাড়ী তৈরী করে পাহাড়ীদের জায়গা-জমি দখল করে নেয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরপর জুম্মদের ভূমি বেদখলের ধারাবাহিক অংশ হিসেবে গত ২৪ নভেম্বর ২০০১ তারিখে চংড়াছড়ি ও লেমুছড়িতে জুম্মদের উপর এক বড় ধরনেরও হামলা হয় - যেখানে কমপক্ষে ২০ জন জুম্ম গুরুতরভাবে আহত হয়। এ হামলায় সেটেলাররা ধরে ধরে পাহাড়ীদের গাড়ী থেকে নামায় এবং ধারালো দা, কিরিচ, বল্লম ও লাঠিসোটা নিয়ে চাঁদের গাড়ীতে আরোহী পাহাড়ীদের আঘাত করে। গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে চংড়াছড়ি ও লেমুছড়িতে জুম্মদের জায়গা-জমির উপর সেটেলারদের বসতবাড়ী নির্মাণকালে স্থানীয় জুম্মরা বাধা দিলে সেটেলাররা এ হামলা চালায়। সে সময়ও সেনা সদস্যরা নীরব দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে থেকে প্রকারান্তরে সেটেলারদের সহায়তা করেছিল।

উল্লেখ্য যে, ২০০১ সালের ১২ এপ্রিল পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান-মেম্বার ও বিভিন্ন মৌজার হেডম্যানদের নিয়ে এক বৈঠক করেন। উক্ত বৈঠকে নির্মিত বাড়ীঘর তুলে নিয়ে সেটেলারদের গুচ্ছগ্রামে ফিরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। পরে ১৯ এপ্রিল ২০০১ এ বিষয়ে খাগড়াছড়ি ব্রিগেড কম্যান্ডারের সাথেও সন্তু লারমার বৈঠক হয়। পরবর্তীতে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে সেটেলার ঘর-বাড়ী উচ্ছেদ নোটিশ জারী করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেটেলারদের গুচ্ছগ্রামে ফিরিয়ে নেয়া হয়নি। অধিকন্তু পরবর্তীতে সেটেলাররা রাতারাতি আরো ঘর-বাড়ী নির্মাণ করে থাকে। এসব ঘর-বাড়ী সেনাবাহিনীর আর্থিক সহায়তায় নির্মিত হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। ২৫০নং লেমুছড়ি মৌজার ১৯ জন পাহাড়ীর ১১০ একর এবং চংড়াছড়ি মৌজার ৪৪ জন পাহাড়ীর ১৮৩ একর মোট ২৯৩ একর জমি এযাবৎ সেটেলাররা দখল করে নিয়েছে। এসব জমি হোল্ডিং নম্বরসহ পাহাড়ীদের বন্দোবস্তী রয়েছে। উপরোক্ত ঘটনাবলীই প্রমাণ করে যে, জুম্ম জনগণকে উচ্ছেদ করে তাদের ভূমি বেদখল করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করাই হচ্ছে মহালছড়ি হামলার মূল উদ্দেশ্য।

মহালছড়ির সাম্প্রদায়িক হামলা ও ওয়াদুদ ভূঁইয়ার প্রলাপ

২৬ আগষ্ট মহালছড়িতে জুম্ম বসতির উপর সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলায় সেটেলার নেতা আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার যে প্রত্যক্ষ মদদ ছিল তা আজ দিবালোকের মতো সকলের কাছে স্পষ্ট। ২৪ আগষ্ট মহালছড়ির ব্যবসায়ী রূপন মহাজনকে ইউপিডিএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক অপহৃত হওয়ার পর পরই ২৫ আগষ্ট ওয়াদুদ ভূঁইয়ার নির্দেশে তাঁর চেলা-চামুন্ডাদের একটি দল মহালছড়িতে আসে। তারা সেদিন মহালছড়িতে সেটেলারদের সাথে গোপন বৈঠক করে। ঐ বৈঠকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সাম্প্রদায়িক হামলার নীলনক্সা প্রণয়ন করা হয়। হামলায় ওয়াদুদ ভূঁইয়ার প্রত্যক্ষ জড়িত থাকার সবচেয়ে জাজ্জ্বল্য প্রমাণ দেয়, খাগড়াছড়ি জেলার ডিসি ও এসপিসহ তিনি মহালছড়িতে অবস্থানকালে চংড়াছড়ি গুচ্ছগ্রাম হতে শত শত সেটেলার এসে লেমুছড়ি ও নোয়াপাড়ায় অগ্নিসংযোগ ও লুঠপাটসহ সংঘবদ্ধ হামলার ঘটনা। আরো জানা গেছে যে, তিনি খাগড়াছড়ি থেকে মহালছড়িতে আসার পথে সেদিন মাইসছড়ি বাজারে কয়েকজন সেটেলারের সাথে কথাবার্তা বলেছেন এবং ঐ সময় লেমুছড়ি, নোয়াপাড়া প্রভৃতি গ্রামে হামলার জন্য সেটেলারদের নির্দেশ দিয়ে এসেছিলেন। ৩১ আগষ্ট ২০০৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির অনুষ্ঠিত সভায় একপর্যায়ে মহালছড়িতে সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় সেটেলার বাঙ্গালী কর্তৃক জুম্ম বসতির উপর সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলার কথা উত্থাপিত হয়। এ সময় আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে বলেন যে, উক্ত ঘটনা পাহাড়ীদের দ্বারা সংঘটিত করা হয়েছে, পাহাড়ীরাই নিজেরাই নিজেদের ঘরবাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করেছে। ১ সেপ্টেম্বর ২০০৩ খাগড়াছড়িতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের এক সভায় তিনি বলেন, পার্বত্যাঞ্চলে উন্নয়ন ধারাকে ব্যাহত করতে মহল বিশেষ চক্রান্ত চালিয়ে এখানকার পরিস্থিতিকে নাজুক করে তুলছে। এ অঞ্চলের পাহাড়ী-বাঙালী ভ্রাতৃত্ববোধে তারা আবারও অশান্তি ছড়িয়ে দেয়ার অপতৎপরতা চালাচ্ছে। মহালছড়ির ঘটনাকে ভিন্নখাতে-প্রবাহিত করতে দু'আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল নিজেদের আধিপত্যকে পাহাড়ী জনগণের মধ্যে সম্প্রসারণ করতে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে উঠে পড়ে লেগেছে বলে তিনি মিথ্যার বেসাতি করেন।

এ প্রসঙ্গে জনকণ্ঠের ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩ প্রকাশিত ফজলুল বারীর রিপোর্ট বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। উক্ত সংবাদে বলা হয়েছে যে, 'খাগড়াছড়ির এমপি আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া বৃহস্পতিবার ঘটনা নিয়ে নয়া সাফাই গাইলেন। ওয়াদুদ ভূঁইয়া বৃহস্পতিবার তার খাগড়াছড়ি শহরে বাসা বৈঠকে ঢাকার একদল সাংবাদিককে বলেছেন, পাহাড়ীরাই গ্রামগুলোতে আগুন দিয়েছে। ঘটনা ঘটেছে ৯টি গ্রামে। কিন্তু এমপি স্বীকার করলেন ৩টি গ্রামের কথা। অন্য ঘটনা নিয়ে বিতর্ক আছে। .....এমপি অবশ্যই স্বীকার করেছেন, তিনি মাত্র ক্ষতিগ্রস্ত তিনটি গ্রামে গেছেন। বাকী গ্রামগুলো বিপজ্জনক, দুর্গম বলে সেগুলোয় যাওয়া যায় না। খাগড়াছড়িতে এমন বিপদজনক, দুর্গম ২টির মতো গ্রাম থাকার কথাও স্বীকার করেছেন এমপি। তিনি সেগুলোকে বলেছেন'অনিরাপদ'। তবে কি ওই অনিরাপদ গ্রামগুলোতেও যখন তখন এধরণের ঘটনা ঘটতে পারে? ওই সব এলাকার বাসিন্দা পাহাড়ী পরিবারগুলোর নিরাপত্তা কোথায়? এমপি এবারে অবশ্য তা স্বীকার না করে বলেছেন, পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। নতুন আর কোথাও ঘটনা ছড়ায়নি। বৃহস্পতিবারের আলোচনায় এমপি মহালছড়ির ঘটনার নিজস্ব একটি বর্নণা দিয়েছেন। যা এর আগে দেয়া খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক, পুলিশ আর সেনা কর্তৃপক্ষ কারও সঙ্গেই মিলে না। এমপি ঘটনাটিকে বলেছেন দাঙ্গা। বলেছেন, পাহাড়ী সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর কাছে এলাকাটি অনেক দিন থেকেই জিম্মি। তারা একের পর এক অপহরণের ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। চাঁদা আর অপহরণের ঘটনা অবিরাম ঘটতে থাকায় এলাকার বাঙালী লোকজন এমনিতেই ক্ষিপ্ত হয়েছিল পাহাড়ীরাও এসব থেকে পাহাড়ীরাও রেহাই পাচ্ছে না। আমরাও সেসব ঠেকাতে পারছি না। আবার বলেন, বিএনিপি ক্ষমতায় আসার পর অপহরণের ঘটনা কমেছে। ঘটনার উৎস, মহালছড়ির রূপন মহাজনকে অপহরণ করেছে কে? এমপি এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কারও নাম বলতে চাননি। বলেছেন, জনসংহতি সমিতি, ইউপিডিএফ দু'গ্রুপের চাঁদাবাজিতেই এলাকায় দীর্ঘদিন থেকে বিশেষ একটি পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। রূপন মহাজনের ঘটনার পর ঘটনা বিস্ফোরিত হয়েছে (রূপন মহাজন অপহরণ প্রসঙ্গে এর আগে সেনা-পুলিশ উভয়পক্ষই বলেছে ইউপিডিএফ-এর কথা)। এমপি বলেন, নিহত বিনোদ বিহারীর মেয়েকে ভাগিয়ে নিয়ে বিয়ের ঘটনায় এলাকার পাহাড়ীরা রূপন মহাজনের উপর ক্ষিপ্ত ছিল। কারণ টিটো নামের যে ছেলেটির বিয়ে করেছে সে রূপনের আত্মীয়। রূপন নিজেও ভাল ছেলে ছিল না। আওয়ামী লীগ করত। চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত ছিল। এমপি বলেন, ঘটনার সকালে পাহাড়ী সন্ত্রাসীরা প্রথম বাঙালীদের উপর উস্কানীমুলক গুলী ছুড়েছে। ওরা সেনাবাহিনীর পোষাক পরে এসেছিল। পাহাড়ীদের সঙ্গে বাঙালীদের সেখানে মুখোমুখি মল্লযুদ্ধও হয়েছে। তারপর সেনাবাহিনীর সদস্যরা এগিয়ে গেলে পাহাড়ী সন্ত্রাসীরা পিছু হটে যাবার সময় গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিয়ে যায়। ওই আগুনে চার বাঙালীর ঘরও পুড়েছে।'

বলাবাহুল্য এটাই হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী, সাম্প্রদায়িক, দুর্নীতিগ্রস্ত ও মহালছড়ি ঘটনার অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী সাংসদ আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার প্রলাপ। আশা করি সুধী পাঠকগণ কেন ওয়াদুদ ভূঁইয়া প্রলাপ বকছেন তা বুঝে নেবেন।

কেন উন্নয়ন বোর্ড চেয়ারম্যান পদ থেকে ওয়াদুদ ভূঁইয়ার অপসারণের দাবী ?

২৬ আগষ্ট মহালছড়িতে জুম্ম বসতির উপর সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে খাগড়াছড়ি থেকে নির্বাচিত এমপি তথা সেটেলার নেতা আবুদল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার অপসারণের দাবী আরো উঠে এসেছে। বলাবাহুল্য, মহালছড়ি হামলায় আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার একমাত্র কারণে তাঁর অপসারণের দাবী আরও জোরালো হয়ে উঠেছে তা নয়; তার দীর্ঘ অপকর্ম ও দুর্নীতিও এর পেছনে রয়েছে। তবে মহালছড়ি হামলার মাধ্যমে দেশবাসীকে আরো আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া কত জঘন্য সাম্প্রদায়িক, জুম্ম বিদ্বেষী ও ষড়যন্ত্রকারী।

গত ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০০২ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘন করে সরকার কর্তৃক উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে নিয়োগ প্রদানকালে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীগণের পক্ষ থেকে তীব্র বিরোধীতা করা হয়। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে বলে উল্লেখ রয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ওয়াদুদ ভূঁইয়া কেবল একজন অউপজাতীয় ব্যক্তি নন, তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবেও বিবেচিত হতে পারেন না।

উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর বিগত দেড় বছরে তাঁর সাম্প্রদায়িক ও চুক্তি পরিপন্থী কার্যক্রম, ক্ষমতার অপব্যবহার, চরম দুর্নীতি ইত্যাদি প্রমাণ করেছে যে, তাঁকে অচিরেই চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণ করা না হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়ন যেমনি চরমভাবে ব্যাহত হবে তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দিন দিন চরম আকার ধারণ করবে। নিম্নে বিগত দেড় বছরাধিক মেয়াদে ওয়াদুদ ভূঁইয়ার সাম্প্রদায়িক ও চুক্তি পরিপন্থী কার্যক্রম, ক্ষমতার অপব্যবহার, চরম দুর্নীতির কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো -

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম সাম্প্রদায়িকীকরণ ঃ

(ক) ইউনিসেফ এর সাহায্যপুষ্ঠ সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পভূক্ত খাগড়াছড়ি জেলার ৮৮টি পাড়া কেন্দ্র, রাঙামাটি জেলার ৬৩টি পাড়া কেন্দ্র এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলার ৮৪টি পাড়া কেন্দ্র সেটেলার অধ্যুষিত এলাকায় স্থানান্তর।

(খ) রাঙামাটি জেলাধীন সাজেক ও বরকল এলাকা থেকে সেটেলার অধ্যুষিত রামগড় ও মানিকছড়িতে কমলা বাগানের প্রকল্প স্থানান্তর। অথচ রামগড় ও মানিকছড়ি এলাকা কমলা বাগানের জন্য সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

(গ) উন্নয়ন বোর্ডের সকল ঠিকাদারী কাজ নানা কৌশলে কেবলমাত্র আত্মীয়-স্বজন ও দলীয় নেতা-কর্মী তথা সেটেলারদের প্রদান।

(ঘ) দলীয় নেতা-কর্মী তথা সেটেলারদের কোন প্রকল্প জমা পড়লে তা অবশ্যই অনুমোদনের জন্য উন্নয়ন বোর্ডের সকল কর্মকর্তা এবং পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বারদের নির্দেশ।

২। ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতি ঃ

(ক) শাস্তিমূলক বদলীসহ নানা হুমকি দিয়ে খাগড়াছড়ির জেলার সাধারণ প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সন্ত্রস্ত অবস্থায় রাখা এবং তাদের মাধ্যমে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি চালিয়ে যাওয়া।

(খ) মুজিবুর রহমান হাওলাদার খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক থাকাকালে 'জেলা স্থান নির্বাচন কমিটি ও জেলা ভূমি বরাদ্ধ কমিটি'র মাধ্যমে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট ভবন নির্মাণের জন্য চেঙ্গী ব্রীজের সন্নিকটে জায়গা চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু ওয়াদুদ ভূঁইয়ার নির্দেশে সিদ্ধান্ত বাতিল করে ইন্সটিটিউটের স্থান সেটেলার অধ্যুষিত শালবন নামক স্থানে স্থানান্তর। উক্ত ভূমির মালিক অমূল্য রঞ্জন চাকমা ও হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরা জায়গাটি ছেড়ে দিতে অসম্মতি জানিয়েছেন। এবং ইন্সটটিউটের ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষকরাও এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন। এ প্রকল্পের মোট ব্যয় ৯৮ লক্ষ টাকা।

(গ) এরশাদ আমলে স্থাপিত খাগড়াছড়ি উপজাতীয় ছাত্রাবাস ওয়াদুদ ভূঁইয়ার নির্দেশে তা এতিমখানায় পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ।

(ঘ) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের গাড়ী (খ-০২-০১০১) তার স্ত্রীর ব্যক্তিগত কাজে ঢাকায় ব্যবহার করা।

(ঙ) মানিকছড়ি উপজেলায় জুম্মদের ১৩০ একর ভূমি বেদখল করে উন্নয়ন বোর্ডের টাকায় সেটেলারদের পুনর্বাসন দিয়ে ওয়াদুদ পল্লী বানানো এবং একই উপজেলায় সেটেলার বাঙালীদের জন্য ভূমি বেদখল করে জিয়া সড়ক নাম দিয়ে রাস্তা নির্মাণ।

(চ) বিগত ইউপি নির্বাচনে বিশেষ করে দীঘিনালা উপজেলাধীন বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদে তাঁর মনোনীত প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার জন্য সন্ত্রাস, কারচুপি, বুথ দখল ইত্যাদি অপকর্মের আশ্রয় গ্রহণ। যেমন ১৯/২/০৩ দীঘিনালা পোমাং পাড়ায় অনুষ্ঠিত এক সভায় তাঁর মনোনীত প্রার্থীদের জয়যুক্ত করা না হলে পাহাড়ী-বাঙালী নির্বিশেষে কাউকে শান্তিতে থাকতে না দেয়া বা কোন উন্নয়ন প্রকল্প না দেয়ার হুমকি; ভোট চলাকালে ফুলচান কাবারী পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে জুম্মদের উপর সেটেলার বাঙালী সন্ত্রাসীদের লেলিয়ে দেয়া; মেরুং ইউনিয়নের উত্তর রেংকায্যা কেন্দ্র ও ভূঁইয়াছড়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে জুম্মদের জোরপূর্বক লাইন থেকে সরিয়ে দিয়ে বুথ দখল করা ইত্যাদি অন্যতম।

(ছ) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করার বিধান থাকলেও আঞ্চলিক পরিষদকে অবজ্ঞা করা এবং কোন দলিল ও তথ্য আঞ্চলিক পরিষদকে সরবরাহ না করার জন্য বোর্ডের কর্মকর্তাদের নির্দেশ।

(জ) উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে গাড়ী ক্রয়ের জন্য সরকারের কৃচ্ছ্রসাধনের নীতিগত সিদ্ধান্ত ও প্রচলিত নিয়মনীতি ভঙ্গ করে বরাদ্দকৃত ২০ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ৫৪ লক্ষ টাকা মূল্যের নিশান পেট্রোল জীপ ক্রয় করা। এছাড়া প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা তছরুপসহ অন্যান্য দুর্নীতি-অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।

(ঝ) সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে ও কোন প্রয়োজন ছাড়া ঢাকার অভিজাত এলাকা গুলশানে মাসিক ৪০ হাজার টাকা ভাড়ায় উন্নয়ন বোর্ডের লিয়াঁজো অফিস ও রেষ্ট হাউসের নামে একটি বিলাস বহুল বাড়ী ভাড়া নেয়া। অথচ রাঙামাটি হচ্ছে বোর্ডের সদর দফতর এবং বোর্ডের সব ধরণের কাজ পার্বত্যাঞ্চল কেন্দ্রীক।

৩। অনুপ্রবেশ, ভূমি বেদখল ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি ঃ

(ক) ওয়াদুদ ভূঁইয়া ও খাগড়াছড়ি রিজিয়ন কমান্ডারের প্রত্যক্ষ মদতে সেটেলাররা লেমুছড়ি মৌজার ১৯ জন জুম্ম অধিবাসীর ১১০ একর এবং চংড়াছড়ি মৌজার ৪৪ জন জুম্ম অধিবাসীর ১৮৩ একর ভূমি বেদখল করা।

(খ) ভূমি বেদখলের অংশ হিসেবে ২০০১ সালের ১৮ মে দীঘিনালা থানার মেরুং, ২৫ জুন রামগড় এবং অতি সম্প্রতি ২৬ আগষ্ট ২০০৩ মহালছড়িতে সাম্প্রদায়িক হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ করা।

(গ) অনুপ্রবেশ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে বগুড়া, নোয়াখালী, চাঁদপুর ইত্যাদি জেলাসহ বিভিন্ন সমতল জেলাগুলোর সাথে খাগড়াছড়ির সরাসরি বাস সার্ভিস চালু করা। এ সকল জেলাগুলো থেকে পরিবারের কর্মক্ষম লোকেরা প্রথমে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করে। এদিকে প্রত্যেক উপজেলা সদরে তাদের জন্য রিক্সা চালানো, রাস্তা-ঘাট মেরামত ও নির্মাণ কাজ, দিন মজুরী সহ বিভিন্ন কর্মসংস্থানের নানা ব্যবস্থা করা হয়। কিছুদিন কাজ করার পর কিছু অর্থ সঞ্চিত হলে এবং এলাকার সাথে পরিচিত হলে পরবর্তীতে সমতল জেলা থেকে স্ব স্ব পরিবার আনার ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে ওয়াদুদ ভূঁইয়া গং-এর সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনায় পোটলা-পুটলিসহ পরিবার-পরিজন নিয়ে উল্লেখিত বাস সার্ভিসের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিনিয়ত বহিরাগত অনুপ্রবেশ ঘটতে দেখা যাচ্ছে।

উপরোক্ত সাম্প্রদায়িক ও চুক্তি পরিপন্থী কার্যক্রম, ক্ষমতার অপব্যবহার, চরম দুর্নীতির কারণে ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে অচিরেই পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণ করা অত্যন্ত জরুরী বলে পার্বত্যবাসী মনে করে।

খাগড়াছড়ি ফরেষ্ট রেঞ্জ অফিস সংলগ্ন এলাকায় সদ্য অনুপ্রবেশকারী বাঙালী পরিবার

মহালছড়ি ঘটনা প্রতিবিধানার্থে দাবী-দাওয়া ও সরকারের নির্লিপ্ততা

ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত

মহালছড়ি হামলার পর স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সকল পর্যায় থেকে একটি অন্যতম প্রধান দাবী উচ্চারিত হয়ে আসছে সেটা হলো - জুম্মদের উপর সংঘটিত মহালছড়ির সাম্প্রদায়িক হামলার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে। কিন্তু ঘটনার পর মাসাধিক কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পরও সরকারের তরফ থেকে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের কোন উদ্যোগ নেই। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি বিষয়ে সরকারের কোন কর্তা ব্যক্তি একটি শব্দও উচ্চবাচ্য করছেন না। গত ৮ সেপ্টেম্বর সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি মহালছড়ি সফরকালে ক্ষতিগ্রস্তরা আশা করেছিলেন যে, স্থায়ী কমিটির প্রতিনিধিদল বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের ঘোষণা দিয়ে যাবেন। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, স্থায়ী কমিটির প্রতিনিধিদল বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি বিষয়টি সুচতুরভাবে এড়িয়ে যান। অপরদিকে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব সৈয়দ মোশতাক বলেছেন যে - মহালছড়ি ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের প্রয়োজন নেই। তাঁর এই কান্ডজ্ঞানহীন ও পক্ষপাতদুষ্ট বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তে সরকারের নির্লিপ্ততার কারণে ক্ষতিগ্রস্তরাসহ পার্বত্যবাসীর মধ্যে সরকারের প্রতি অধিকতর সন্দেহ ও সংশয় দেখা দিয়েছে।

দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার

অপরদিকে ঘটনার পর পর সেনাবাহিনী ও পুলিশ কর্তৃক কিছু সংখ্যক সেটেলার বাঙালীকে গ্রেপ্তারকেও প্রশাসনের প্রহসন হিসেবে মনে করছে ক্ষতিগ্রস্তরা। যেখানে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহায়তায় এবং পুলিশের নীরব মদদে সেটেলাররা একের পর এক জুম্ম গ্রামে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করে সেখানে সেটেলার বাঙালীদের গ্রেপ্তার করা লোক দেখানো ছাড়া অন্য কিছু নয় বলে ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের অভিমত। মুখ্যতঃ জুম্ম জনগণের অসন্তোষকে প্রশমিত করা এবং দেশের জনমতকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যেই এই গ্রেপ্তারী নাটক করা হচ্ছে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

অপরদিকে সরকারের পক্ষে মহালছড়ি থানার ওসি হাফিজুর রহমান বাদী হয়ে ২৭ আগষ্ট ২০০৩ বাবুপাড়া স্লুইসগেইট ঘটনায় ৪/৫ হাজার অজ্ঞাতনামা লোকের বিরুদ্ধে একটি মামলা এবং লেমুছড়ি ঘটনায় সংশ্লিষ্ট করে ২৮ আগষ্ট ২০০৩ তারিখে ২ (দুই) হাজার অজ্ঞাতনামা লোকের বিরুদ্ধে আরো একটি মামলা দায়ের করা হয়। উল্লেখ্য যে, মামলা দু'টিতে সুনির্দিষ্টভাবে কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করা হয়নি। উক্ত মামলার অভিযোগে নির্দিষ্টভাবে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি-না তাও জানা যায়নি। অপরদিকে ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মরা আশঙ্কা প্রকাশ করছে যে, পরবর্তীতে এসব মামলায় জড়িত করে তাদেরকে হয়রানি করা হবে। তাছাড়া গত ১ সেপ্টেম্বর লেমুছড়ি গ্রামের অধিবাসী কিশলয় চাকমা (৩২) পীং কালি রতন চাকমা জুম্মদের গ্রামে অগ্নিসংযোগ, লুঠপাট, ধ্বংসসহ সাম্প্রদায়িক হামলায় জড়িত করে ৪৪ জন সেটেলার বাঙালীর বিরুদ্ধে খাগড়াছড়ি কগনিজেন্স ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এক মামলা দায়ের করেছেন। কিন্তু উক্ত মামলায় অভিযুক্ত কাউকে এখনো গ্রেপ্তার করা হয়নি বলে জানা যায়।

সেনাবাহিনী ও সেটেলার বাঙালীদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সরিয়ে নেয়া

মহালছড়ি সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা আরেকবার প্রমাণ করে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাশাসন 'অপারেশন উত্তরণ'সহ অস্থায়ী সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার করা এবং সেটেলার বাঙালীদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সরিয়ে অন্যত্র পুনর্বাসন করা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। কেননা এরা বরাবরই তুচ্ছ ঘটনাগুলোকেও সাম্প্রদায়িক হামলায় রূপ দেয়। তাই সকল মহল থেকে অনতিবিলম্বে অপারেশন উত্তরণসহ সকল অস্থায়ী সেনা, আনসার, এপিবি ও ভিডিপি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা এবং জয়সেন কার্বারী পাড়া, চংড়াছড়ি ও পাকুজ্যাছড়ি গুচ্ছগ্রামসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য এলাকার সকল সেটেলার বাঙালীদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন করার দাবী উত্থাপিত হয়েছে। এমনকি মহালছড়ি হামলার অন্যতম মদদদাতা ও ষড়যন্ত্রকারী, উগ্র সাম্প্রদায়িক ও দুর্নীতিবাজ আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড থেকে অপসারণের দাবী উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সরকার উক্ত দাবীর প্রতি কোন কর্ণপাত করছে না। পক্ষান্তরে বাঙালী সমন্বয় পরিষদ, নাগরিক ফোরাম, খাগড়াছড়ি জেলার চার দলীয় জোটের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক, উস্কানীমূলক, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বক্তব্য ও কর্মসূচীর মাধ্যমে পরিস্থিতিকে অবনতির দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। অপরদিকে ক্ষতিগ্রস্তদের গৃহ নির্মাণসহ পুনর্বাসন কার্যক্রম পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদকে উপেক্ষা করে সেনাবাহিনীর মাধ্যমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে পার্বত্যাঞ্চলে চরম বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করে তুলবে।

মহালছড়ি সাম্প্রদায়িক হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন

জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে মহালছড়ি হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণ কমিটি গঠন

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মহালছড়ি উপজেলা শাখার আহ্বায়ক বিমলকান্তি চাকমাকে প্রধান করে একটি ত্রাণ সংগ্রহ কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সহায়তায় লেমুছড়ি, বাবুপাড়াসহ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় আরও কয়েকটি ত্রাণ বিতরণ কমিটি গঠন করা হয়। রাঙামাটি জেলায় ত্রাণ সংগ্রহের জন্য জনসংহতি সমিতির জেলা কমিটি দায়িত্ব পালন করে। তারা বিলাইছড়ি, ঘাগড়া, বালুখালীসহ রাঙামাটি শহর এলাকা থেকে সর্বস্তরের জনগণের কাছ থেকে ত্রাণ সংগ্রহ করেন। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মদের সাহায্যের জন্য ত্রাণসামগ্রী নিয়ে বিভিন্ন সংগঠন এগিয়ে আসে। গত ২৯ আগষ্ট ২০০৩ রোজ শুক্রবার পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য শ্রী রক্তোৎপল ত্রিপুরার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণের জন্য মহালছড়ি এলাকায় যান। ২৫০ নং লেমুছড়ি মৌজার লেমুছড়ি এবং ২৫২ নং থলিপাড়া মৌজার বাবুপাড়া, থলিপাড়া ও রামেসু কার্বারী পাড়াসহ কতিপয় ক্ষতিগ্রস্ত জুম্ম গ্রাম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, হিল ট্র্যাক্টস এনজিও ফোরাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদেরকে কিছু ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। এছাড়াও মারমা উন্নয়ন সংসদ, ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদ, মারমা সংগঠন ঐক্য পরিষদ, পার্বত্য বৌদ্ধ মিশন, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল প্রভৃতি সংগঠন থেকে চাল, নগদ অর্থ, কাপড়-চোপড়, ঔষধপত্র প্রভৃতি ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

জেলা প্রশাসনের ত্রাণ কার্যক্রম

খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ সাহায্য হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে মোট ৪ লক্ষ টাকা এবং ১২০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য পাওয়া গেছে। এসব ত্রাণ সাহায্য ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রয়োজনের তুলনায় এসব ত্রাণ সাহায্য অত্যন্ত অপ্রতুল বলে ক্ষতিগ্রস্তরা জানিয়েছে। অপরদিকে সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ প্রদান করা। সরকারের তরফ থেকে কয়েক দফা আপদকালীন ত্রাণ সাহায্য প্রদান করা হলেও ক্ষতিগ্রস্তদের গৃহ নির্মাণসহ পুনর্বাসনের জন্য কোন পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে বলে জানা যায়নি। বিশেষ করে ঘরবাড়ী না থাকার কারণে ক্ষতিগ্রস্তরা খোলা আকাশের নীচে কিংবা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে অত্যন্ত মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের অবস্থা সবচেয়ে করুণ বলে জানা গেছে। বই-পুস্তকের অভাবে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা জীবন এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

সেনাবাহিনীর গরু মেরে জুতা দানের উদ্যোগ

ঘটনায় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহায়তায় ঘটার কথা যখন একের পর এক উন্মোচিত হয় তখন সেনাবাহিনী গরু মেরে জুতা দান করে নিজেদের দোষ ধামাচাপা দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ঘটনার পরদিন ২৭ আগষ্ট ২০০৩ সেনাবাহিনীর চিফ অফ জেনারেল ষ্টাফ মেজর জেনারেল এস এম ইকরামুল হক এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল মইন ইউ আহমেদ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এ সময় তারা ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে ত্রাণদাতা সাজার অপচেষ্টা করেন। অতিসম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সেনাবাহিনীকে সেই জুতা দানের উদ্যোগ হিসেবে অর্থ যোগান দেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। জানা গেছে যে, মহালছড়িতে জুম্ম বসতির উপর সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের ঘরনির্মাণসহ পুনর্বাসনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে এবং সেনাবাহিনীর মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জানা গেছে যে, সেনাবাহিনীর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত প্রকল্পের উপর মতামতের জন্য প্রথমে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রাণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনানুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদই বৈধ প্রতিষ্ঠান বিধায় সেনাবাহিনীর পরিবর্তে পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু সেনাবাহিনীও সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান - এই অজুহাতে সেনাবাহিনীর মাধ্যমে তথাকথিত উক্ত পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। অপরদিকে সেনাবাহিনীর মাধ্যমে পুনর্বাসনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হলে ক্ষতিগ্রস্তরা তা মেনে নেবে না বলে জানা গেছে। বিশেষ করে যেখানে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহায়তায় উক্ত হামলা সংঘটিত হয়েছে সেখানে সেনাবাহিনীর দেয়া যে কোন অনুদান বা পুনর্বাসন কার্যক্রম কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না বলে ক্ষতিগ্রস্তরা জানিয়েছে। ইতিমধ্যে গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৩ চট্টগ্রাম ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল মঈন ইউ আহমেদ মহালছড়িতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে গেলে লেমুছড়ি ত্রিরত্ন বৌদ্ধ বিহার এবং পদ্মশোভা চাকমা নামে জনৈক ক্ষতিগ্রস্তের বসতভিটায় গৃহ নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে এসেছেন এবং বাবুপাড়া বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ ওয়ামেজু ভিক্ষুকে পিতলের তৈরী বুদ্ধ মুর্তি হস্তান্তর করে এসেছেন - যা জাতীয় পত্র-পত্রিকায় ফলাওভাবে প্রচার করা হয়। জিওসি লেমুছড়িতে আসার আগে স্থানীয় সেনা জোন কর্তৃক সেটেলার বাঙালীদের দিয়ে ভস্মিভূত লেমুছড়ি ত্রিরত্ন বৌদ্ধ বিহারের ছাই পরিষ্কার করা এবং কোন ধর্মীয় বিধিবিধান অনুসরণ না করে ত্রিরত্ন বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ উদ্বোধন করার প্রেক্ষিতে এলাকাস্থ ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ দায়ক-দায়িকাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

ইউপিডিএফের অপরিণামদর্শী কার্যক্রম

মহালছড়ি ঘটনার পর পরই চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ ক্ষতিগ্রস্তদের নিয়ে খাগড়াছড়ির স্বনির্ভর এলাকায় এক সভা আহ্বান করে। এলক্ষ্যে খাগড়াছড়ি সদর এলাকার ৭২ জন মুরুব্বীকে চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু তম্মধ্যে মাত্র ৫/৬ জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়। বিশেষ করে তাদের (ইউপিডিডিএফ) দ্বারা রূপন মহাজনকে অপহরণ এবং এই অপহরণ ঘটনার সুযোগে সেনা ও সেটেলারদের জুম্ম গ্রামে হামলাকে কেন্দ্র করে জুম্মদের মধ্যে ইউপিডিএফের বিরুদ্ধে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। এই বিরূপ জনমতকে প্রশমিত করা এবং ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার হীণ উদ্দেশ্যেই ইউপিডিএফ উক্ত সভা আহবান করে। কিন্তু তাদের সেই হীণ উদ্দেশ্য পরিপূরণে ব্যর্থ হওয়ার পর অনন্যোপায় হয়ে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় সড়ক অবরোধের ডাক দেয়া হয়। ইউপিডিএফের এহেন অপরিণামদর্শী কার্যক্রমের জন্য জুম্মদের মধ্যে আরো তীব্রতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে আহুত সড়ক অবরোধের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের নিকট ত্রাণসামগ্রী পৌছে দেয়াও কঠিন হয়ে পড়ে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের দুর্গতি আরো চরম আকার ধারণ করে।

জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে রাঙামাটিতে বিক্ষোভ সমাবেশ

মহালছড়ি সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে তাৎক্ষণিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার উদ্যোগে রাঙ্গামাটি শহরে ২৭ আগষ্ট ২০০৩ বিকাল ৪:০০ ঘটিকায় এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলটি সমিতির জেলা কার্যালয় হয়ে বনরূপা পেট্রোল পাম্প এলাকায় সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। জনসংহতি সমিতির রাঙামাটি জেলার সভাপতি গুণেন্দু বিকাশ চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য সুধাসিন্ধু খীসা। এছাড়া সমাবশে বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির রাঙামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক পলাশ খীসা, পিসিপি'র সভাপতি উজ্জ্বল চাকমা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। উক্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন যে, সেনাবাহিনী, সাধারণ প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের ছত্রছায়ায় সেটেলাররা এই হামলা চালিয়েছে। জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার পরিকল্পণাধীনে কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের ষড়যন্ত্রে এই হামলা সংঘটিত হয়। সমাবেশে ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত, দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবী জানানো হয়।

রক্তোৎপল ত্রিপুরার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতি প্রতিনিধিদলের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন

ঘটনার পর পরই ২৯ আগষ্ট ২০০৩ রোজ শুক্রবার পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য শ্রী রক্তোৎপল ত্রিপুরার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদল ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরনের জন্য মহালছড়ি এলাকায় যান। ২৫০নং লেমুছড়ি মৌজার লেমুছড়ি এবং ২৫২নং থলিপাড়া মৌজার বাবুপাড়া, থলিপাড়া ও রামেশু কার্বারী পাড়াসহ বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত জুম্ম গ্রাম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং ঘটনার ক্ষতিগ্রস্ত কিছু সংখ্যক জুম্ম নারী-পুরুষদের সাথে সাক্ষাত করে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হন। তখন প্রতিনিধিদল ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত সকলের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং সম্ভাব্য সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

মহালছড়িতে সেটেলার বাঙালীদের তথাকথিত শান্তি সমাবেশ

২৯ আগষ্ট ২০০৩ মহালছড়িতে বিএনপি'র খাগড়াছড়ি জেলা সভাপতি দেওয়ান আবুল কালামের সভাপতিত্বে সেটেলার বাঙালীদের তথাকথিত এক শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে অন্যান্যদের মধ্যে উগ্র সাম্প্রদায়িক সেটেলার নেতা আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া, মহালছড়ি সেনা জোন কম্যান্ডার মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, মহালছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খিজির আহমেদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া পাহাড়ীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করেন।

জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে বান্দরবানে বিক্ষোভ সমাবেশ

৩০ আগষ্ট ২০০৩ জনসংহতি সমিতির বান্দরবান সদর থানা শাখার উদ্যোগে বান্দরবানে মহালছড়ি ঘটনার প্রতিবাদে প্রতিবাদ সমাবেশ আয়োজন করা হয়। সমিতির সদর থানা শাখার সভাপতি উছোমং মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক জলি মং মারমা, সমিতির বান্দরবান জেলা শাখার সদস্য ওয়াইচিং প্রু মারমা, পিসিপির জেলা শাখার সভাপতি পুশৈথোয়াই মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক থুইম্রানু মারমা প্রমুখ।

বক্তারা মহালছড়িতে জুম্মদের উপর হামলার জন্য সেটেলার ও চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফকে দায়ী করেন। তারা বলেন যে, মূলতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্যই সরকারের একটি বিশেষ মহল কর্তৃক ইউপিডিএফকে দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহার করছে। বক্তারা ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের যথাযথ ক্ষতিপূরণ এবং দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী করেন।

ঢাকা-চট্টগ্রামসহ তিন পার্বত্য জেলায় পিসিপি'র বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল

মহালছড়ি সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটিতে ৩০ আগষ্ট ২০০৩ এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্বরে পিসিপির বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা মহানগর পিসিপির সহ সভাপতি উক্যসিং মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পিসিপির কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মংকিউজাই চাক, শিক্ষা, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক রিটন আসাম, কেন্দ্রীয় হিরণ মিত্র চাকমা, ঢাকা মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক পল্লব চাকমা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সমাবেশ পরিচালনা করেন মহানগর শাখার নিখিল মিত্র চাকমা। বক্তরা ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী করেন। সমাবেশে ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের জুম্ম ছাত্রছাত্রীরা মৌন মিছিল সহকারে সমাবেশে যোগদান করেন।

চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত মিছিলটি সকাল ১১.০০ ঘটিকা সময় চট্টগ্রাম রেল ষ্টেশন থেকে আরম্ভ হয়ে কোতোয়ালী থানা ঘুরে শহীদ মিনারে এসে শেষ হয়। এরপর শহীদ মিনারে এক সংক্ষিপ্ত বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি রেবতি চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মংসিংঞো মারমা, কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক সম্পাদক চঞ্চু চাকমা, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক কনিষ্ক চাকমা, চবি শাখার সভাপতি আনন্দ জ্যোতি চাকমা, ছাত্র ইউনিয়নের অন্যতম নেতা শ্যামল চাকমা। সমাবেশটি পরিচালনা করেন মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক ক্য ক্য মং মারমা। সমাবেশে মহালছড়ি ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত, দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবী করা হয়।

প্রথমে মিছিলটি পিসিপি জেলা কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে বনরূপা পেট্রোল পাম্প ঘুরে এসে জেলা প্রশাসকের প্রাঙ্গণে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। পিসিপি জেলা শাখার সভাপতি আসীন চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির রাঙামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক পলাশ খীসা, পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক বিনোতাময় ধামাই, পিসিপি'র রাঙামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক টুলু মারমা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সমাবেশে বক্তারা বলেন, সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহায়তায় সেটেলাররা জুম্ম গ্রামে হামলা করে। একই পরিবারের মা ও দুই মেয়েসহ মোট ১০ জন জুম্ম নারীকে সেনা সদস্য ও সেটেলার বাঙালীরা ধর্ষণ করেছে বলে বক্তারা অভিযোগ করেন। বক্তারা ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের যথাযথ ক্ষতিপূরণ এবং দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী করেন।

খাগড়াছড়ি সদর থানা পিসিপির সভাপতি নিউটন মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির জেলা শাখার ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক ছাত্রনেতা ব্রজ কিশোর ত্রিপুরা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সভাপতি কাঁকন চাকমা, কলেজ শাখার সভাপতি তহিন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভানেত্রী চৈতালী ত্রিপুরা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সমাবেশ শেষ একটি মিছিল শহরের প্রধান প্রধান প্রদক্ষিণ করে।

বান্দরবান জেলা পিসিপি'র সভাপতি পুশৈথোয়াই মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক জলি মং মারমা, সমিতির বান্দরবান জেলা শাখার সদস্য ওয়াইচিং প্রু মারমা, সদর থানার সভাপতি উছোমং মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক থুইম্রানু মারমা ও জেলা শাখার সভাপতি মেঞোচিং মারমা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সর্বস্তরের জনগণের পক্ষে জনসংহতি সমিতির বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

মহালছড়িতে সেটেলারদের দ্বারা সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে ও প্রতিবিধানার্থে ১ সেপ্টেম্বর ২০০৩ খাগড়াছড়ির খাগড়াছড়ি জেলার সর্বস্তরের জনগণের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে এম এন লারমার ভাস্কর্যের পাদদেশ থেকে এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি খাগড়াছড়ি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হয় এবং এতে এক বিক্ষোভ সমাবেশ

অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির সহ-সাধারণ সম্পাদক তাতিন্দ্র লাল চাকমা, প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক সন্তোষিত চাকমা বকুল, ব্রজ কিশোর ত্রিপুরা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সভাপতি উজ্জ্বল চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভানেত্রী চৈতালী ত্রিপুরা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সমাবেশে বক্তারা সেনা সদস্যদের ছত্রছায়ায় সেটেলারদের কর্তৃক সংঘটিত মহালছড়ি হামলার তীব্র নিন্দা জানান। বিক্ষোভ সমাবেশ শেষে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়। উক্ত স্মারকলিপিতে নিম্নোক্ত দাবীনামা জানানো হয়-

১। ২৬ আগষ্ট ২০০৩ মহালছড়ি উপজেলায় সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে।
২। উক্ত ঘটনায় জড়িত হামলাকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত প্রয়োজনীয় ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৩। ঘটনায় শিকার ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য কমপক্ষে ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা ক্ষতিপুরণসহ পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৪। উক্ত ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারকে ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত বিনামূল্যে রেশন প্রদান করতে হবে এবং অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য-পুস্তক জরুরী ভিত্তিতে সরবরাহ করতে হবে।
৫। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাসহ সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে যাতে অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তজ্জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পার্বত্য ভিক্ষু সংঘের মৌন মিছিল ও স্মারকলিপি প্রদান

১ সেপ্টেম্বর ২০০৩ খাগড়াছড়ি শহরে পার্বত্য ভিক্ষু সংঘের উদ্যোগে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের এক মৌন মিছিল আয়োজন করা হয়। সকাল হতেই খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার থেকে শত শত ভিক্ষু খাগড়াছড়ি সদরস্থ জনবল বৌদ্ধ বিহার প্রাঙ্গনে এসে জমায়েত হয়। সকাল ১০ টায় সেখান থেকে ভিক্ষুদের মৌন মিছিলটি শুরু হয়ে শাপলা চত্বর প্রদক্ষিণ করে পরে আবার মিছিলটি জনবল বৌদ্ধ বিহার প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হয়। মিছিল শেষে পার্বত্য ভিক্ষু সংঘ জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে ৬ দফা দাবী সম্বলিত একটি স্মারকলিপি প্রদান করে। পার্বত্য ভিক্ষু সংঘ স্মারকলিপিতে মহালছড়ির ঘটনাকে অমানবিক ও বর্বরোচিত বলে অভিহিত করে। স্মারকলিপিতে সন্নিবেশিত দাবীগুলি নিম্নরূপঃ

১। যত শীঘ্র সম্ভব এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত অনুষ্ঠিত করা এবং সেই তদন্ত প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ করা।
২। ভস্মীভূত ও ক্ষতিগ্রস্ত বৌদ্ধ বিহারসমূহ সরকারী অর্থ ব্যয়ে পুন:নির্মাণ করা এবং বুদ্ধমূর্তিসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা।
৩। বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং ধর্মান্তরকরণ বন্ধ করা।
৪। ভবিষ্যতে যাতে আর কোনরূপ ধর্মীয় হামলা, ধর্মীয় নির্যাতন সংঘটিত না হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করা।
৫। এ ঘটনার জন্য প্রকৃত দায়ী ও দোষী ব্যক্তিদেরকে অনতিবিলম্বে গ্রেফতারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা।
৬। এই ঘটনায় হতাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত সকল ব্যক্তি ও পরিবারকে জরুরী ভিত্তিতে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানপূর্বক সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

জেলা প্রশাসকের আইন-শৃঙ্খলা সভা ও সিদ্ধান্ত ছাড়াই শান্তি-শৃঙ্খলা মনিটরিং কমিটি গঠন

১ সেপ্টেম্বর ২০০৩ খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এক বিশেষ আইন-শৃঙ্খলা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মহালছড়ির বাঙালী ব্যবসায়ী রূপন মহাজনের অপহরণকারী ইউপিডিএফ প্রতিনিধিদেরও আহ্বান করায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং এর প্রতিবাদে আঞ্চলিক পরিষদ এবং জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিরা সভা বর্জন করেন। উক্ত সভায় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পাহাড়ী-বাঙালী সমন্বয়ে একটি শান্তি কমিটি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও সিদ্ধান্তহীনভাবে সভা শেষ হয়। কিন্তু উক্ত সভায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)-কে আহ্বায়ক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি শান্তি-শৃঙ্খলা মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয় বলে পরবর্তীতে অংশগ্রহণকারীদের জানানো হয়। উক্ত কমিটিতে আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য শ্রী রক্তোৎপল ত্রিপুরার সম্মতি না নিয়ে তাকে সদস্য হিসেবে রাখা হয়। মূলত: সেটেলার বাঙালীদের সাম্প্রদায়িক হামলাগুলোকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার নামে সাধারণ প্রশাসনের পক্ষ থেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এসব শান্তি কমিটি গঠন করা হয়ে আসছে।

বিলাইছড়িতে মহালছড়ি হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ

২ সেপ্টেম্বর ২০০৩ জনসংহতি সমিতি ও এর অঙ্গ সংগঠনের উদ্যোগে বিলাইছড়িতে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির বিলাইছড়ি শাখার সভাপতি শুভ মঙ্গল চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন অমৃত সেন তঞ্চঙ্গ্যা, সুব্রত দেওয়ান, আশীষ চাকমা, শ্যামাবতী চাকমা ও চন্দ্র লাল চাকমা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। বক্তারা ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত, ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারসমূহের যথাযথ ক্ষতিপূরণ এবং দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী করেন। সমাবেশে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণ সাহায্য প্রদানের জন্য জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানানো হয়।

বাংলাদেশ বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক ফোরামের নিন্দা

২ সেপ্টেম্বর ২০০৩ বাংলাদেশ বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক ফোরামের কর্মকর্তাবৃন্দ এক বিবৃতিতে মহালছড়িতে বৌদ্ধ মূর্তি ভাংচুর এবং বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস করার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও নিন্দা প্রকাশ করেন। বিবৃতিতে তারা মহালছড়িতে ধ্বংসপ্রাপ্ত বৌদ্ধ বিহারের পুনঃ নির্মাণ, জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণ বন্ধ, মহালছড়ি ঘটনার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরন প্রদানসহ তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবী জানান। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাষ্টি ফোরামের উপদেষ্টা ও হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান কল্যাণ ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুশীল বড়ুয়া ও চন্দ্রগুপ্ত বড়ুয়া, ফোরামের সভাপতি দেবদুলাল বড়ুয়া মিন্টু, সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া, সহ সভাপতি অমলেন্দু বড়ুয়া, রঞ্জিত বড়ুয়া, দীপঙ্কর বড়ুয়া, সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য হিমাদ্রী বড়ুয়া, বিনয় বড়ুয়া, অরূপ বড়ুয়া, নয়ন বড়ুয়া প্রমুখ।

একদল সিনিয়র সাংবাদিক এবং মানবাধিকার কর্মীর মহালছড়ি সফর

৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩ ঢাকা থেকে আগত একদল সিনিয়র সাংবাদিক এবং মানবাধিকার কর্মী মহালছড়িতে সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় সেটেলার বাঙ্গালী কর্তৃক জুম্ম বসতির উপর সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলা সরেজমিন পরির্দশনে আসেন। উক্ত প্রতিনিধিদলে 'প্রথম আলো'র সাইফুল ইসলাম চৌধুরী, 'জনকণ্ঠ'এর ফজলুল বারী, 'ভোরের কাগজ'এর রফিকুল ইসলাম মন্টু, 'সাপ্তাহিক ২০০০'এর গোলাম মোর্তজা, 'ডেইলী স্টার'এর পিনাকী রায়, 'আজকের কাগজ'এর সাইফুল ইসলাম রিপন প্রমুখ সিনিয়র সাংবাদিকবৃন্দ এবং ব্লাস্ট-এর মোঃ রাশেদ শেখ, রিসার্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েট (আরডিসি) এর পরিচালক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়য়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, আইন ও সালিস কেন্দ্র-এর মোঃ টিপু সুলতান ছিলেন। তারা ঘটনাস্থল সরেজমিন পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে কথাবার্তা বলেন। এছাড়া খাগড়াছড়ির এমপি আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া, জেলা প্রশাসক হুমায়ুন কবির খান, পুলিশ সুপার মতিউর রহমান শেখ প্রমুখদের সাথেও সাক্ষাৎ করেন।

ঘটনাস্থল সরেজমিন পরিদর্শন শেষে তারা বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে হামলার তান্ডবতা তুলে ধরেন। তাদের রিপোর্টে সেনাবাহিনী এবং খাগড়াছড়ির এমপি ও সেটেলার নেতা আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার প্রত্যক্ষ মদদে সেটেলাররা এ হামলা ঘটিয়েছে বলে ফুটে উঠে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পশ্চিমা হানাদার বাহিনী থেকেও অধিকতর বর্বরোচিত হামলা সংঘটিত হয়েছে বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেন। ঘটনাটি সেনাবাহিনী ও ওয়াদুদ ভূঁইয়ার যোগসাজসে সংঘটিত হয়েছে বলে খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসকও উক্ত প্রতিনিধিদলের কাছে প্রকারান্তরে স্বীকার করেন। এমপি আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার সাথে কথা বলার সময় তাঁর উগ্র সাম্প্রদায়িক ও জুম্ম বিদ্বেষী মনোভাবে বহিঃপ্রকাশ দেখে তারা স্তম্ভিত হয়ে পড়েন।

গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের প্রতিবাদ

৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩ গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটির সদস্য বদরুদ্দীন ওমর, ফয়জুল হাকিম লালা, হাসিবুর রহমান, মৃদুল কান্তি দাস ও ডাঃ আবদুল হাকিম এক বিবৃতিতে মহালছড়িতে সেনা সদস্য ও সেটেলার কর্তৃক জুম্মদের ঘরবাড়ীতে অগ্নিসংযোগ, হত্যা ও হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বিবৃতিতে তারা বলেন, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এদেশের শাসকশ্রেণী ক্ষুদ্র জাতিসত্তার উপর অব্যাহত লুন্ঠন ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে এসেছে। পার্বত্য জেলাসমূহে এই লুন্ঠনের রাজত্ব কায়েম করতে সমতলবাসী, বাঙালী জনগণের একাংশকে ব্যাপকভাবে বসতি স্থাপন করতে দিয়ে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জমির অধিকার কেড়ে নিয়েছে। জমির উপর বাঙালী জনগণের দখলদারিত্ব কায়েম করার জন্যই পাহাড়ী-বাঙালীর দ্বন্দ্বকে উস্কে দেয়া হয়েছে। পার্বত্য জেলাসমূহে অলিখিত সেনাশাসন চলছে বলে তারা অভিযোগ করেন। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ মহালছড়ি ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য সরকারের কাছে জোর দাবী জানান।

গণ ফোরাম ও সিপিবি'র নিন্দা

৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩ পৃথক পৃথক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গণ ফোরামের সভাপতি এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবি ডঃ কামাল হোসেন এবং গণ ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দিন মানিক এবং বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির (সিপিবি) সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান খান এবং সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম মহালছড়িতে জুম্মদের উপর সেটেলারদের হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। গণ ফোরামের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে মহালছড়িতে পাহাড়ীদের উপর বর্বরোচিত হামলা চালানো হয়। দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে সরকার কার্যতঃ নির্যাতককারীদেরই সাহায্য করে চলেছে বলে তারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পাহাড়ী জনগণকে তাদের জায়গা-জমি থেকে উৎখাত করে সেগুলোর দখলের জন্যই স্বার্থান্বেষী মহল এই হামলা চালিয়েছে। সরকারের মদদ না পেলে স্বার্থান্বেষী মহলের এ ধরণের কর্মকান্ড কখনোই সফল হতে পারে না। অপরদিকে হামলা চলাকালে প্রশাসন কর্তৃক হামলাকারীদের সাহায্য করাকে চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে তারা উল্লেখ করেন।

তিন পার্বত্য জেলায় পিসিপি'র বিক্ষোভ সমাবেশ ও স্মারকলিপি পেশ

৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলায় মহালছড়ি হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পিসিপি'র জেলা অফিস থেকে রাঙামাটি মিছিলটি শুরু হয়ে বনরূপা পেট্রোল পাম্প ঘুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এসে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। রাঙামাটি জেলা পিসিপি'র সভাপতি আসীন চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য প্রদান করেন জনসংহতি সমিতির রাঙামাটি জেলা শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক বোধিসত্ব চাকমা, পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সভাপতি উজ্জ্বল চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভানেত্রী চৈতালী ত্রিপুরা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

পিসিপি'র জেলা অফিস থেকে বান্দরবানের মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান প্রদক্ষিণ শেষে ঐতিহাসিক বটতলায় সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। পুশৈথোয়াইং মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি মংখ্যাই চিং মারমা, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক বিনোতাময় ধামাই, জেলা শাখার রণেশ তঞ্চঙ্গ্যা, অংচউ মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের জেলা সাধারণ সম্পাদক এচিং প্রু মারমা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সভা পরিচালনা করেন জেলা সাধারণ সম্পাদক শৈমং প্রু মারমা। পিসিপি'র জেলা অফিস থেকে খাগড়াছড়ির মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান প্রদক্ষিণ শেষে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। পিসিপি'র জেলা সভাপতি কাঁকন চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি বিধায়ক চাকমা, কেন্দ্রীয় সদস্য মিলন বিকাশ ত্রিপুরা, জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক উদয়ন ত্রিপুরা, টিপু চাকমা, প্রত্যুষ চাকমা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সভা পরিচালনা করেন জেলা সাধারণ সম্পাদক বিহানু চৌধুরী। সমাবেশ শেষে তিন পার্বত্য জেলায় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে নিম্নোক্ত ৬ দফা দাবী সম্বলিত এক স্মারকলিপি প্রদান করা হয় -

১। মহালছড়ি উপজেলায় সেটেলার কর্তৃক জুম্ম গ্রামে হামলার ঘটনা অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে।

২। মহালছড়ি হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত জুম্ম পরিবারগুলোকে যথাযথ পুনর্বাসন করতে হবে। উক্ত ঘটনায় সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের সকল দোষী ব্যক্তিদের যথাযথ শাস্তি প্রদান করতে হবে।

৩। ভূমি বেদখল, গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ, বহিরাগত বাঙালীদের অভিবাসন এবং সামাজিক বনায়নের নামে বহিরাগতদের পুনর্বাসন বন্ধ করতে হবে।

৪। পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী ভূমি কমিশন গঠন এবং অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে।

৫। অবিলম্বে পার্বত্য চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৬। বহিরাগত বাঙালী অভিবাসীদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন করতে হবে।

গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনসমূহের নিন্দা

৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩ গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দ এক যৌথ বিবৃতিতে মহালছড়িতে জুম্মদের উপর হামলার নিন্দা জানিয়েছেন। বিবৃতিতে তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের একটা অংশ। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী পাহাড়ী জাতিসত্ত্বাসমূহ এদেশেরই নাগরিক। কাজেই পাহাড়ী জনগণের উপর হামলার ঘটনায় তারা নিশ্চুপ থাকতে পারে না। এ ঘটনা তাদেরকে বিক্ষুব্দ করে তুলেছে বলে উল্লেখ করেন। বিবৃতিতে তারা ঘটনার অনতিবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা, হামলায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ, নিহত ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরণের কোন ঘটনা না ঘটে সে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ৪ দফা দাবী জানান। বিবৃতিতে স্বাক্ষর প্রদান করেন বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মনিরুদ্দীন, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি হাসান ইমাম, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের খালেকুজ্জান লিপনসহ ৯ জন কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতা।

বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার অভিযোগ

সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা মহালছড়িতে হামলার বিষয়ে বলেন যে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে জোট সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। তিনি ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩ ঢাকার বিয়াম মিলনায়তনে স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের তৃতীয় কাউন্সিল অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে একথা বলেন। তিনি আরও বলেন যে, খাগড়াছড়ির মহালছড়িতে পাহাড়ীদের বাড়ীঘরে হামলা ও মেয়েদের ধর্ষণ করা হয়েছে। অথচ শান্তিচুক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি সম্ভাবনাময় এলাকায় পরিণত হয়েছিল।

১১ দলের মহালছড়ি সফর

৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩ রোজ শনিবার ১১ দলের ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল ঢাকা থেকে খাগড়াছড়ির মহালছড়ি ঘটনা সরেজমিনে পরিদর্শন করতে আসেন। গণফোরামের প্রেসিয়াম সদস্য পংকজ ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যরা হচ্ছেন কমরেড আনিসুর রহমান মল্লিক, কমরেড আহসান হাবিব লাবলু, কমরেড জাহেদ আহমেদ টুটুল এবং বাসদের চট্টগ্রাম সমন্বয়ক কমরেড রাজেকুজ্জামান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। বিকেল পৌনে ৫টা নাগাদ প্রতিনিধি দলটি মহালছড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

প্রতিনিধিদলটি সরাসরি বাবুপাড়ায় গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ী পরিদর্শন করেন। এ সময় পুড়ে যাওয়া ধানের ছাঁই কুড়িয়ে নেন প্রতিনিধিদল প্রধান পংকজ ভট্টাচার্য্য। অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে তারা ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মদের হৃদয় বিদারক ঘটনার বর্ণনা শোনেন। তারা কেন, কিভাবে এবং কোথা থেকে ঘটনার সূত্রপাত হয় তারও বিস্তারিত অবহিত হন। তারা ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সহমর্মিতা ও সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং ঢাকায় গিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবীসহ ক্ষতিগ্রস্তদের দুঃখ-দুর্দশার কথা দেশবাসীর নিকট তুলে ধরবেন বলে জানান। প্রতিনিধিদলটি খাগড়াছড়ি ফেরার পথে লেমুছড়িতে ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে কথা বলেন। তারা পুড়ে যাওয়া ত্রিরত্ন বৌদ্ধ বিহারের ভাঙ্গা বুদ্ধ মুর্ত্তি ও কিছু ঘর-বাড়ী দেখেন। এ পর্যন্ত সরকারের তরফ থেকে কি ধরণের সাহায্য প্রদান করা হয়েছে তার খোঁজখবর নেন প্রতিনিধিদলের সদসস্যরা। গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদলের কাছে একটি স্মারকলিপিও প্রদান করা হয়।

ঘটনার ধামাচাপা দিতে সেটেলার বাঙালীদের সাংবাদিক সম্মেলন

মহালছড়িতে জুম্মদের উপর একতরফা হামলার ঘটনা ধামাচাপা দিতে এবং দেশী-বিদেশী জনমতকে বিভ্রান্ত করতে ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩ খাগড়াছড়ি প্রেস ক্লাবে বাঙালী সমন্বয় পরিষদের নামে সেটেলার বাঙালীরা সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করে। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে নানা কায়দায় পাহাড়ীদের বিরুদ্ধে বিষোদাগার করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মহালছড়ি উপজেলা বিএনপি সভাপতি ও বাঙালী সমন্বয় পরিষদের আহ্বায়ক ও মহালছড়ি হামলার অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী দেওয়ান মোহাম্মদ আবুল কামাল। সম্মেলনে মিথ্যা অভিযোগ করা হয় যে, পাহাড়ীরা নাকি প্রথমে বাঙালীদের বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করেছে।

মহালছড়ি ঘটনায় আওয়ামী লীগের বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী

৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩ আওয়ামী লীগের ধানমন্ডির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল মহালছড়িতে জুম্মদের উপর বর্বরোচিত সাম্প্রদায়িক হামলার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী জানিয়েছেন। তিনি বলেন যে, পুলিশ ও নিরাপত্তারক্ষীদের উপস্থিতিতে পাহাড়ীদের ঘরবাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। পাহাড়ী নারীর শ্লীলতাহানির মতো পাশবিক ঘটনা ঘটেছে বলে তিনি দাবী করেন। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় আরো উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা আবদুস সামাদ আজাদ, তোফায়েল আহমেদ, বেগম মতিয়া চৌধুরী, ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

মহালছড়ি হামলার নিন্দা জানিয়েছে SAPUFC

৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩ The South Asian People's Union against Fundamentalism and Communalism (SAPUFC) মহালছড়িতে সেটেলার কর্তৃক জুম্মদের উপর হামলার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেছে। ঢাকায় অনুষ্ঠিত এ সভায় SAPUFC-এর পক্ষ থেকে হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং ঘটনার শিকার জুম্মদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবী করেছে। SAPUFC-এর পক্ষ থেকে আরো বলা হয় যে, চার দলীয় জোট ক্ষমতায় আসার পর থেকে সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন-নির্যাতন বৃদ্ধি পেয়েছে।

'মহালছড়ির কান্না' নামে ঢাকায় ভিডিও চিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা

৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩ জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, আরডিসি, ব্লাস্ট এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্র-এর যৌথ উদ্যোগে সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় সেটেলার বাঙালী কর্তৃক মহালছড়ির পাহাড়ী গ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলার উপর 'মহালছড়ির কান্না' নামে একটি ভিডিওচিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শুরুতে প্রারম্ভিক বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং। এরপর আরডিসি সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মেসবাহ কামাল মহালছড়িতে জুম্ম গ্রামে সেটেলারদের সাম্প্রদায়িক হামলার বর্ণনা দেন। এরপর 'মহালছড়ির কান্না' নামে জুম্ম গ্রামসমূহে সেটেলারদের পৈশাচিক হামলার উপর নির্মিত ভিডিওচিত্র প্রদর্শিত হয়। ভিডিওচিত্র প্রদর্শনীর পর অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য সুধাসিন্ধু খীসা, পার্বত্য ভিক্ষু সংঘ-বাংলাদেশ এর সভাপতি ভদন্ত সুমনালঙ্কার মহাথেরো, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পরিচালক সুলতানা কামাল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

প্রারম্ভিক বক্তব্যে আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং প্রশ্ন রেখে বলেন যে, মহালছড়ি ঘটনার মত নৃশংস হামলার প্রতিবিধান চেয়ে আদিবাসী জনগণ কার কাছে আবেদন জানাবে? কার কাছে গেলে সমাধান পাবে? তারা কি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন প্রণেতা সংস্থা জাতীয় সংসদের কাছে গেলে সমাধান পাবে? নাকি সুশীল সমাজের কাছে গেলে সমাধান পাবে? নাকি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে গেলে সমাধান পাবে? তিনি অত্যন্ত বেদনাভারাক্রান্ত ও হতাশার সাথে বলেন, যার কাছে যাওয়া যাক না কেন আদিবাসীরা মৌখিক সহানুভূতি ছাড়া প্রকৃত কোন প্রতিবিধান পায় না।

আরডিসি সাধারণ সম্পাদক মেসবাহ কামাল মহালছড়িতে জুম্ম গ্রামে সেটেলারদের সাম্প্রদায়িক হামলার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, মহালছড়িতে জুম্মদের উপর সেটেলারদের হামলাটি ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। কারণ ঘটনাস্থলের পাশে সেনা ক্যাম্প, এপিবিএন ক্যাম্প, পুলিশ ক্যাম্প তথা স্থানীয় প্রশাসন ছিল। তাদের নাকের ডগায় এভাবে সংঘবদ্ধ সেটেলার কর্তৃক জুম্মদের শত শত ঘরবাড়ীতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও ধ্বংসযজ্ঞ এবং তাদের উপর হত্যা ও ধর্ষণের ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত না হলে কোনভাবেই সম্ভব হতে পারে না। তিনি মহালছড়ির এই নারকীয় ঘটনাকে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধকালীন সময়কার বাঙালীদের উপর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বর্বর কার্যকলাপের সাথে তুলনা করেন। একটি স্বাধীন দেশেও এ ধরণের অমানবিক নারকীয় কান্ড ঘটতে পারে তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এ ঘটনার জন্য সেনাবাহিনী ও সেটেলাররাই দায়ী বলে তিনি উল্লেখ করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য শ্রী সুধাসিন্ধু খীসা বলেন, পাকিস্তান আমল হতেই পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। পাকিস্তান সরকার ১৯৪৮ সালে ভারত থেকে আসা হাজার হাজার মুসলিম বাঙালীদের লংগদু, নানিয়ারচর, নাইক্ষ্যংছড়ি এলাকায় পুনর্বাসন করে। ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ দিয়ে পঞ্চাশ হাজার একরের অধিক উর্বর জমি জলমগ্ন করা হয় এবং ১৯৬৫ সালে হাজার হাজার মুসলিম বাঙালী মাটিরাংগা, রামগড় ইত্যাদি এলাকায় পুনর্বাসন করা হয়। জিয়া সরকারের আমলে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় লক্ষ লক্ষ বহিরাগত বাঙালী পুনর্বাসন করা হয়। গত ২৬ আগষ্ট মহালছড়িতে জুম্মদের উপর সংঘটিত সেটেলারদের বর্বর হামলাও পার্বত্য চট্টগ্রাম মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার ষড়যন্ত্রেরই অংশ বলে তিনি জোরালো অভিমত ব্যক্ত করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মহালছড়ি সফর

৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩ রোজ সোমবার বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রতিনিধিদলটি ২৬ আগষ্ট ২০০৩ মহালছড়ির নৃশংস ঘটনার সরেজমিনে দেখতে খাগড়াছড়ি সফর করেন। মোশাররফ হোসেন, এমপি (ফেনী-৩) এর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপমন্ত্রী মনি স্বপন দেওয়ান, এমপি (রাঙামাটি), শাহজাহান চৌধুরী, এমপি (কক্সবাজার-৪), মুফতি মোওনালা আবদুস সাত্তার আখন্দ, এমপি (বাগেরহাট-৪), গাজী মোঃ শাহজাহান, এমপি (চট্টগ্রাম-১১), সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, এমপি (বরিশাল-২), মোস্তফা কামাল পাশা, এমপি (চট্টগ্রাম-৩) এবং আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া, এমপি (খাগড়াছড়ি)।

মধ্যাহ্ন ভোজের পর দলটি মহালছড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। যাওয়ার সময় তারা গাড়ী থেকে নেমে লেমুছড়ির পোড়া কয়েকটি দোকানঘর ও বাড়ী দেখেন এবং সামান্য ভিডিও চিত্র ধারণ পূর্বক লেমুছড়ি পটপট্যা ক্লাবের মাঠে সমাগত ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন প্রতিনিধিদলের প্রধান মোশাররফ হোসেন এমপি। বক্তব্যে তিনি বলেন, ক্ষতিগ্রস্তদের দুঃখ দুর্দশা সরেজমিনে দেখতে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নির্দেশে তারা ঢাকা থেকে এসেছেন। ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন করা হবে বলে তিনি জানান। যে ঘটনা ঘটেছে, পরবর্তীতে এরকম ঘটনা আর ঘটবে না বলে তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের আশ্বাস দেন।

তাঁর বক্তব্য শেষ হলে লেমুছড়ির ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মরা স্থায়ী কমিটির প্রতিনিধিদল প্রধানকে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন এবং মৌখিকভাবে ঘটনার বিবরণ তুলে ধরেন। ক্ষতিগ্রস্তরা বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপমন্ত্রী মণি স্বপন দেওয়ানের নিকট তাদের দুঃখ-দুর্দশা ও বেদনার কথা তুলে ধরেন। এক পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্তরা বিভিন্ন দাবী-দাওয়া উত্থাপন করলে জবাবে উপমন্ত্রী মণি স্বপন বলেন 'মর হাত-ঠ্যাং বান্যা' অর্থাৎ আমার হাত-পা বাধা। এরপর প্রতিনিধিদলের গাড়ীর বহর মহালছড়ি সেনা জোনের রাস্তা ধরে উপজেলা সদরে রওয়ানা দেয়। বিকাল ৪টার দিকে উপজেলা সদরে পৌছার পর পরই উপজেলার টাউন হলে প্রতিনিধিদল এক জনসভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভায় প্রতিনিধিদলের প্রধান মোশাররফ হোসেন এমপি তার বক্তব্যে বলেন, এখানে সকল মানুষই সমান। এখানে কে পাহাড়ী কে বাঙ্গালী সেটা বিবেচ্য নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন যে, কিছু কুচক্রীমহল ঘটনাটিকে নানা রং দিয়ে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে। পরিশেষে তিনি বলেন, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। তারা ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এরপর মোয়াজ্জেম হোসেন এমপি বলেন, পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের ঘটনা ঘটছে। এখানে এক ব্যক্তি অপহৃত হয়েছে বলে এত হিংসা হানা-হানি হবে এমনতো হতে পারে না। তিনি স্থানীয় প্রশাসনকে দায়ী করে বলেন, কেন ২৪ আগষ্ট রূপন মহাজন অপহৃত হওয়া সত্ত্বেও তাকে উদ্ধারের ব্যবস্থা নেয়া হয়নি? এ ব্যাপারে যারা প্রশাসনে রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি জানান। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপমন্ত্রী মণি স্বপন দেওয়ান তাঁর বক্তব্যে ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। ঘটনার প্রকৃত দোষীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি নিজের চোখে যা দেখলেন তা প্রধানমন্ত্রীকে গিয়ে বলবেন বলে ক্ষতিগ্রস্তদের আশ্বস্থ করেন।

প্রতিনিধিদলের সদস্যরা মুলতঃ বিএনপিরই সাফাই গেয়ে চলে গেছেন। প্রতিনিধিদলের প্রধান মোশাররফ হোসেন তো এক পর্যায়ে বলেই ফেলেছেন যে, জিয়ার আদর্শে বিএনপি গঠিত। সেই বিএনপি কখনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করতে পারে না। এই হামলার পেছনে বিএনপি নেতা আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল তিনি তা অনুধাবন করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হন। এমনকি হামলার জন্য সেটেলার বা সেনাসদস্যদের কাউকে দায়ী না করে কেবল দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দেয়া হবে বলে বক্তব্য শেষ করেন। পক্ষান্তরে এ ঘটনার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলসমূহকে দায়ী করে প্রকৃত ঘটনা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা চালান। এমনকি প্রতিনিধিদলের সদস্যরা ক্ষতিগ্রস্থদের পেশকৃত স্মারকলিপির দাবীনামাও ব্যাপারেও কোন উচ্চবাচ্য করেননি। বিশেষ করে হামলার বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যাপারে সকল মহল থেকে দাবী থাকা সত্ত্বেও তারা এটা সচতুরভাবে এড়িয়ে যান। ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে স্থায়ী কমিটির প্রতিনিধিদলের প্রতি তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়।

বাঙালী সমন্বয় পরিষদের বিক্ষোভ সমাবেশ

সেদিন ৮ সেপ্টেম্বর ছিল বাঙালী সমন্বয় পরিষদ ও ইউপিডিএফের কর্মসূচী। স্থায়ী কমিটির প্রতিনিধিদলের সদস্যরা মহালছড়িতে পৌছার আগে মাহালছড়ি সদর দখল করে সাম্প্রদায়িক শ্লোগান ও বক্তব্য দিতে থাকে। স্বভাবতই মহালছড়ি উপজেলা টাউন হলে অনুষ্ঠিত জনসভায় ৯৯% লোক ছিল সেটেলার বাঙ্গালী। টাউন হলের সামনে আগে থেকেই টাঙানো ছিল বাঙ্গালী সমন্বয় পরিষদ নামে সেটেলারদের একটি ব্যানার। ব্যানারে লিখা ছিল - ইউপিডিএফ এর কার্যকলাপ বন্ধ কর, বাঙ্গালী হত্যা বন্ধ কর। সভার শুরুতেই প্রতিনিধিদলের নিকট বাঙ্গালী সমন্বয় পরিষদের পর পর ২টি স্মারকলিপি (একটি স্থানীয় হিন্দু বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের স্মারকলিপিসহ) প্রদান করা হয়।

ইউপিডিএফের ষড়যন্ত্রমূলক বিক্ষোভ সমাবেশ

অপরদিকে স্থানীয় থলিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে ইউপিডিএফ সেদিন বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজন করে। ক্ষতিগ্রস্ত সকল গ্রামবাসীদের উক্ত সমাবেশে যোগদানের জন্য ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা বাধ্য করে। অপরদিকে সেদিন ছিল হাটের দিন। বাজারের দিকে যাওয়া সকল যানবাহন থামিয়ে ইউপিডিএফের সদস্যরা যাত্রীদের সমাবেশে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক স্থায়ী কমিটির প্রতিনিধিদলের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সফরকালে তাদের নিকট হামলার বিবরণ তুলে ধরার বা দাবী-দাওয়া উথাপন করার জন্য কোন ব্যক্তি (লেমুছড়ি গ্রামের কয়েকজন ছাড়া) সুযোগ পায়নি। স্থায়ী কমিটির প্রতিনিধিদলের নিকট ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মরা যাতে প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরতে না পারে, পক্ষান্তরে কেবলমাত্র সেটেলারদের বক্তব্যই যাতে প্রতিনিধিদলের নিকট একতরফাভাবে উপস্থাপন করা যায় সেলক্ষ্যে ইউপিডিএফ, সেনাবাহিনী ও ওয়াদুদ ভূঁইয়া গং এভাবে মহালছড়িতে ইউপিডিএফ ও বাঙালী সমন্বয় পরিষদের পাল্টাপাল্টি সমাবেশ আয়োজন করে এক ধরণের কৃত্রিম আতঙ্ক সৃষ্টির কৌশল অবলম্বন করেছে বলে এলাকাবাসীর ধারণা।

আওয়ামী লীগের সংসদীয় প্রতিনিধিদলের মহালছড়ি পরিদর্শন

ফলোআপ সংবাদ

৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩ রোজ মঙ্গলবার সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা এডভোকেট আব্দুল হামিদের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ৫ সদস্য বিশিষ্ট এক সংসদীয় প্রতিনিধিদল মহালছড়ির ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন লে. কর্ণেল (অবঃ) ফারুক খান, এমপি; বীর বাহাদুর, এমপি; ফজলে করিম চৌধুরী, এমপি এবং শামসুর রহমান শরীফ, এমপি। প্রতিনধিদলটি ঢাকা থেকে খাগড়াছড়ি এসে পৌছার সাথে সাথে বেলা দেড়টার দিকে মহালছড়ি উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। প্রথমে বাবু পাড়ার ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে সাক্ষাত করেন এবং বৌদ্ধ বিহারে গিয়ে ভগ্ন বুদ্ধ মূর্ত্তিগুলো সরেজমিন দেখেন। এরপর প্রতিনিধিদল প্রধান এডভোকেট আব্দুল হামিদ ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উপর হামলা খুবই লোমহর্ষক ও অমানবিক। সরকার বা প্রশাসন রক্ষা করতে পারতো। ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারকে ঘরবাড়ী নির্মাণ করে দেয়া ও খাদ্যশস্য প্রদানের জন্য তিনি সরকারের কাছে দাবী জানান। অতীতের মত পাহাড়ী-বাঙ্গালী সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে শান্তি পূর্ণ জীবনযাপন করার পরামর্শ দেন। সংসদে গেলে তারা ক্ষতিগ্রস্তদের কথা উত্থাপন করবেন বলে তিনি আশ্বাস প্রদান করেন। বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ক্ষতিগ্রস্তদের দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে সামিল হয়ে একাত্মতা ও সংহতি প্রকাশ করতে তারা মহালছড়িতে এসেছেন বলে জানান।

এরপর প্রতিনিধিদলটি কেরেঙ্গ্যানালের দিকে যেতে চাইলে মহালছড়ির জোন কমান্ডার লে. কর্ণেল মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল বাধা প্রদান করেন। অনেক কথা কাটাকাটির পর দলটি থানা পাড়া থেকে ইঞ্জিন চালিত নৌকাযোগে দুরপয্যানাল হয়ে কেরেঙ্গ্যানাল যান। সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের দুঃখ-দুর্দশার কথা ও ঘটনার বিবরণ শুনেন। ধর্ষিতা কালা সোনা চাকমাসহ তার পরিবারের সকলের সাথে কথা বলেন। কালাসোনা তার আট মাসের শিশু নাতনীকে যেভাবে গলা টিপে মেরে ফেলা হয়েছে তার বর্ণনা দেন।

বিরোধী দলীয় উপনেতা এডভোকেট আব্দুল হামিদ কেরেঙ্গ্যানাল এবং দুরপয্যনালে সংক্ষিপ্ত পথসভা করেন। সেখান থেকে ফিরে এসে মহালছড়ি বাজারে এক সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, এই ঘটনা খুবই নিন্দনীয়, লোমহর্ষক এবং অমানবিক। এরপর অপহৃত রূপন মহাজনের বাড়ীতে প্রতিনিধিদল যায়। বাড়ীর ভিতর ঢুকার পরপরই অপহৃত রূপন মহাজনের বাবা কান্না জড়ানো কণ্ঠে "রূপন মহাজনকে উদ্ধারের দাবী জানান। চেয়ারম্যান আর্কিমিডিস চাকমাই তাঁর ছেলেকে অপহরণ করেছে এবং সেই একমাত্র উদ্ধার করতে পারবে বলে তিনি জানান। এ সময় আর্কিমিডিস চাকমা বিজয় মহাজনের বাড়ীর ভিতর না ঢুকে বাইরে অবস্থান করে।

এরপর প্রতিনিধিদলটি মহালছড়ির ইউএনও-র সাথে সাক্ষাৎ করেন। মহালছড়ি থেকে ফেরার পথে প্রতিনিধিদলটি লেমুছড়ি গ্রামের পুড়ে যাওয়া ঘরবাড়ী ও ত্রিরত্ন বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন করেন। এ সময় লেমুছড়ির শিক্ষক প্রজ্ঞাজ্যোতি চাকমা ঘটনার বিবরণ তুলে ধরে বলেন, তখন বেলা ২টা হতে পারে। নিকটবর্তী চংড়াছড়ি সেটেলার বাঙালী গুচ্ছগ্রাম থেকে ৩০/৪০ জনের একদল সেটেলার লেমুছড়ির দিকে আসতে দেখে তাৎক্ষণিকভাবে তারা প্রতিরোধ না করে নিকটবর্তী এপি ব্যাটেলিয়ন ক্যাম্পে ও রাস্তার আর্মিদের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু সরকারের নিরপত্তা বাহিনীর সদস্যরা তাদের নিরাপত্তা তো দেয়নি বরং বলে যে, সেটেলারদের হাতে অস্ত্র আছে, কাজেই যে যেদিকে পারো পালিয়ে জীবন রক্ষা কর। ততক্ষণে মহালছড়ির দিকে কয়েকটি জায়গায় কালো ধোয়া উঠছে বলে তিনি জানান। তারপর আর কোন উপায়ান্তর না দেখে গ্রামবাসীরা পালায়। সেটেলাররা হালের গরু, সহায় সম্পত্তি সব লুট করে নিয়ে যায়, বুদ্ধমূর্ত্তি ভাঙচুর করে এবং ৩টি পিতলের বুদ্ধ মুর্ত্তি লুট করে নিয়ে যায় বলে তিনি জানান। এ সময় মেম্বার-কাবরীরাও অনুরূপ বর্ণনা প্রতিনিধিদলকে ব্যক্ত করেন।

এরপর এডভোকেট আব্দুল হামিদ এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ঘটনা সংঘটিত করা হয়েছে। তিনি একজন বিচারপতিকে প্রধান করে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবী করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে এ অসহায় দরিদ্র মানুষের উপর আর যেন এ ধরণের ঘটনার সম্মুখীন হতে না হয় সেরূপ নিশ্চয়তা বিধানের জন্যও তিনি সরকারের নিকট দাবী রাখেন। এডভোকেট আব্দুল হামিদ এমপি ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্যে ২ লক্ষ টাকা প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। এ প্রতিনিধিদলের সাথে আর্কিমিডিস চাকমা, কিরণ মার্মা, অনিমেষ চাকমাসহ কয়েকজন ইউপিডিএফ নেতাকে দেখা যায়। তারও আগে ৮ সেপ্টেম্বর ঢাকার ধানমন্ডিস্থ আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিং-এ আওয়ামী লীগ মহালছড়ি ও পাবনা জেলার চকতারাপুরে বর্বরোচিত ও কাপুরুষোচিত হামলার ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী জানিয়েছে। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন দলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল এমপি। লিখিত বক্তব্যে বলা হয় যে, দেশের তিন পার্বত্য জেলার পরিস্থিতি ক্রমেই অশান্ত ও উত্তেজনাপ্রবণ হয়ে উঠছে। যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বিরোধী, যারা সেই অঞ্চলে কোনভাবেই স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক তা চায় না, তারাই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন করে অশান্তি, হানাহানি, সংঘাত ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির অপচেষ্টা করছে। এই সকল অপশক্তিই নিজেদের মধ্যে গোপন যোগসাজশ ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে শান্তি চুক্তিকে অকার্যকর করতে চায়।

'মহালছড়ি হামলায় ইন্ধন যুগিয়েছে বিএনপি-জামাত' - ১১ দল

খাগড়াছড়ি জেলার বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামের নেতৃবৃন্দ জুম্মদের উপর মহালছড়িতে সংঘটিত বর্বরোচিত হামলায় ইন্ধন যুগিয়েছে বলে ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৩ ঢাকাস্থ ওয়াকার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেছে ১১ দলের নেতৃবৃন্দ। তারা ঘটনার জন্য সরকার ও প্রশাসনকে দায়ী করেছে। প্রেস ব্রিফিং-এ লিখিত প্রতিবেদন পাঠ করেন ১১ দলের অন্যতম নেতা আনিসুর রহমান মল্লিক। প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ঘটনার দিন শত শত সেটেলার বাঙালী মহালছড়ির বিভিন্ন জুম্ম গ্রামে বর্বর আক্রমণ করে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের পরনের কাপড় ছাড়া কোন কিছুই বাঁচানো যায়নি। অগ্নিসংযোগের পাশাপাশি গ্রামগুলোতে চলেছে বেপরোয়া লুটপাট। পাহাড়ী কৃষকদের পোড়া ধানের গন্ধে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বাতাস এখনো ভারী হয়ে আছে বলে উল্লেখ করা হয়। আরো বলা হয় যে, এ অমানবিক বর্বরোচিত হামলার পর ক্ষতিগ্রস্তদর জন্য তেমন কোন ত্রাণ সাহায্য দেয়া হয়নি। যে ত্রাণ সাহায্য দেয়া হয়েছে তাও প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। ক্ষতিগ্রস্তদের খাবার সংকট সবচেয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে বলে উল্লেখ করা হয়। মাঠ পর্যায়ে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ১১ দলের নেতৃবৃন্দ জানান, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সতর্ক থাকলে এই ঘটনা ঘটতো না। ক্ষতিগ্রস্তদের বরাত দিয়ে নেতৃবৃন্দ জানান, সেনাবাহিনী ও পুলিশের সহায়তায় সেটেলার বাঙালীরা এ হামলা চালিয়েছে। প্রেস ব্রিফিং-এ ১১ দলের মহালছড়ি ঘটনা পরিদর্শন টীমের সদস্য ছাড়া বক্তব্য রাখেন রাশেদ খান মেনন, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, শহীদুল্লাহ চৌধুরী, হাজী আবদুস সামাদ, আবদুল্লাহ সরকার, বিমল বিশ্বাস, দিলীপ বড়ুয়া প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। প্রেস ব্রিফিং কালে তারা সরকারের কাছে নিম্নোক্ত ৫ দফা দাবী উপস্থাপন করেন -

১। মহালছড়ি ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে দোষী ব্যক্তি ও সরকারের প্রশাসনের ব্যক্তিবর্গকে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধান করা।

২। মহালছড়ি ঘটনায় ১০ গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে নিজ গ্রাম স্ব স্ব জায়গায় পুনর্বাসিত করা এবং সেই সাথে ক্ষতিগ্রস্ত বৌদ্ধ বিহারগুলো পুনঃ নির্মাণ করাসহ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহের মানুষগুলোকে বাঁচানোর জন্য পর্যাপ্ত রিলিফের ব্যবস্থা করা।

৩। পাহাড়ে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করা,

৪। পুনর্বাসিত বাঙালীদের সরকারের পূর্ণ পরিকল্পনা মোতাবেক পুনর্বাসিত করা, বিরোধপূর্ণ জমির মীমাংসার জন্য সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ভূমি কমিশন গঠন করে ভূমি সমস্যার সমাধান করা।

৫। সেনাশাসনের অবসান করে রাজনৈতিক ও সিভিল প্রশাসনের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

বাংলাদেশ বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিষদের মানববন্ধন

১০ সেপ্টেম্বর ২০০৩ সকাল ১০ ঘটিকায় বাংলাদেশ বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিষদের উদ্যোগে ঢাকার কমলাপুরস্থ ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার সংলগ্ন অতীশ দীপঙ্কর সড়কে মহালছড়িতে সংঘটিত নৃশংস সাম্প্রদায়িক হামলা ও বৌদ্ধ মন্দিরে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের প্রতিবাদে এক মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করে। এতে অসংখ্য বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ শতাধিক লোক অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ঘটনাস্থল পরিদর্শন

১০ সেপ্টেম্বর ২০০৩ বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির এক প্রদিনিধিদল ক্ষতিগ্রস্ত মহালছড়ি এলাকা সরেজমিন পরিদর্শনে যান। প্রতিনিধিদলে ছিলেন রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অবঃ) জেড এ খান এবং আইসিআরসি'র বাংলাদেশস্থ হেড অব দ্য ডেলিগেশন টনি মেরিয়ন। এ সময় তারা তিনশত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে ফ্যামিলি কীট বস্ত্র, খেজুর ও বিস্কুট বিতরণ করেন।

বাংলাদেশ বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিষদের মানববন্ধন

১০ সেপ্টেম্বর ২০০৩ সকাল ১০ ঘটিকায় বাংলাদেশ বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিষদের উদ্যোগে ঢাকার কমলাপুরস্থ ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার সংলগ্ন অতীশ দীপঙ্কর সড়কে মহালছড়িতে সংঘটিত নৃশংস সাম্প্রদায়িক হামলা ও বৌদ্ধ মন্দিরে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের প্রতিবাদে এক মানব বন্ধন কর্মসূচী পালন করে। এতে অসংখ্য বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ শতাধিক লোক অংশগ্রহণ করেন।

হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের সভায় নিন্দা

১২ সেপ্টেম্বর ২০০৩ ঢাকায় খৃষ্টান চার্চ কমিউনিটি সেন্টারে বোধিপাল মহাথেরোর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় মহালছড়িতে জুম্মদের উপর সংঘটিত হামলার নিন্দা জ্ঞাপন ও দাবী জানানো হয়। এতে মহালছড়িতে জুম্মদের উপর সেটেলার বাঙালীদের সাম্প্রদায়িক হামলাকে একটি নারকীয় ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তারা দ্রুত ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও নিরাপত্তা প্রদানসহ হামলায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবী জানিয়েছেন। তাছাড়াও সংখ্যালঘুদের উপর ক্রমবর্ধমানহারে নির্যাতন, ধর্ষণ ও মানবাধিকার লংঘনের জন্য সরকারের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।

আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের মহালছড়ির ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন

১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা সাম্প্রদায়িক হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত মহালছড়ি উপজেলার কয়েকটি জুম্ম গ্রাম পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুধাসিন্ধু খীসা, কে এস মং মারমা, ডাঃ নীলু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, রওশন আরা বেগম, মাধবীলতা চাকমা, উনুপ্রু চৌধুরী, থৈোয়াচিং চৌধুরী প্রমুখ পরিষদের সদস্যবৃন্দ। পরিদর্শনকালে চেয়ারম্যান মহোদয় উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা, পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদ্বয়ের সাথে একান্ত বৈঠকে মিলিত হয়ে গত ২৬ আগষ্ট সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলা সম্পর্কে জানতে চান। এরপর তিনি এলাকার ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্য, হেডম্যান, কার্বারী ও বাজারের কমিটিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে একটি সভা করেন। তারপর তিনি ক্ষতিগ্রস্ত রামেইসু কার্বারী পাড়া, বাবুপাড়া ও লেমুছড়ি পরিদর্শন করেন।

এসময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেতৃবর্গও উপস্থিত ছিলেন। এদিন তিন পার্বত্য জেলা থেকে সংগৃহীত সর্বস্তরের জনসাধারণের পক্ষ থেকে প্রদত্ত ত্রাণসামগ্রীও বিতরণ করা হয়।

ফেরার পথে লেমুছড়িতে শ্রী লারমা ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে মিলিত হয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন যে, যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী ও এ অঞ্চলে শান্তি চায় না তারাই মহালছড়িতে সাম্প্রদায়িক হামলা চালিয়েছে। এ হামলাটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে ঘটানো হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিত্তোর সময়ে জুম্মদের উপর সেটেলার বাঙালীরা এধরণের সাম্প্রদায়িক হামলা কমপক্ষে ৬ বার চালিয়েছে বলে তিনি জানান। সেনাশাসনের ছত্রছায়ায় সেটেলার বাঙালীরা এভাবে একের পর এক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের একটি বিশেষ মহল তাদের মদত দিচ্ছে। কিন্তু এই মাটি আমাদের, ভূমি আমাদের। তাই আমাদের এখানে বাস করার সাহস সঞ্চয় করতে হবে।

তিনি আরও বলেন যে, এখন ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন বাড়ীঘর তৈরী করে দেওয়া, তাদের সন্তানদের স্কুলের বইপত্র যোগাড় করে দেওয়া, জীবিকার্জনের পথ সৃষ্ট করা এবং সর্বোপরি একটি নিরাপত্তামুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তাই তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে আহ্বান রাখেন তারা যেন নিজেদের ভূমিতে বাস করার জন্য সাহস সঞ্চয় করেন, পরিস্থিতি মোকাবেলায় ভীত না হন। তিনি আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ হতে সম্ভাব্য সকল প্রকারের সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন।

জাতীয় পার্টি সংসদীয় প্রতিনিধিদলের পরিদর্শন

১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩ জাতীয় পার্টির (এরশাদ) ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল মহালছড়ির ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। জাতীয় পার্টির প্রেসিয়াম সদস্য গোলাম হাবিব দুলাল এমপি'র নেতৃত্বে পরিদর্শনে আসা প্রতিনিধিদলের মধ্যে আরো ছিলেন করিম উদ্দিন ভরসা এমপি, প্রেসিয়াম সদস্য শেখ শওকত হোসেন নিলু, ভাইস চেয়ারম্যান এটিএম গোলাম মওলা চৌধুরী এবং দপ্তর সম্পাদক রেজাউল করিম ভূঁইয়া। তারা বাবুপাড়ার ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন ঘরবাড়ী দেখেন ও ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে কথা বলেন। তারা সংঘটিত ঘটনার জন্য দু:খপ্রকাশ করেন এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী জানান। ক্ষতিগ্রস্তদের বলেন যে, তারা সংসদে গিয়ে বিষয়টি তুলে ধরবেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সমিতির বিক্ষোভ সমাবেশ

গত ১৪ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়ি জেলার এমএন লারমার ভাস্কর্যের পাদদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির খাগড়াছড়ি জেলা শাখার উদ্যোগে এক বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমিতিন সভাপতি শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। সভায় সভাপতিত্ব করেন খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি শ্রী প্রণতি বিকাশ চাকমা। এতে আরও বক্তব্য রাখেন সুধাসিন্ধু খীসা, উনুপ্রু চৌধুরী, রওশন আরা বেগম, শক্তিপদ ত্রিপুরা, কেএস মং, উজ্জ্বল চাকমা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সমাবেশ পরিচালনা করেন ব্রজ কিশোর ত্রিপুরা।

প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রী লারমা বলেন যে, 'সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন করছে না, আবার তার কতিপয় বিশেষ মহল চুক্তি লংঘন করে চলেছেন। এখন তারা চুক্তিকে লংঘনের পাশাপাশি চরম ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। মহালছড়িতে জুম্মদের গ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও জুম্ম বিরোধী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। এই হামলায় সুস্পষ্টভাবে সেনাবাহিনীর ২১ ইবিআর এ সদস্যরা জড়িত ছিল। তাদের সক্রিয় সহযোগিতায় উন্মত্ত সেটেলার বাঙালীরা এই জঘন্য হামলা চালিয়েছে। আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া এমপি প্রত্যক্ষ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকে সাম্প্রদায়িক ও জুম্ম বিদ্বেষী চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন। সে উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদের ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে নিজের নামে সেটেলার গ্রাম গড়ে তুলছে। দুর্নীতি করে ঢাকায় উন্নয়ন বোর্ডের জন্য বাড়ী ভাড়া করেছে। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের গাড়ী নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করছে।

তিনি আরও বলেন যে, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যান নক্ষত্রলাল দেব বর্মণ এই সকল অপকর্মে সহযোগিতা করে চলেছেন। মহালছড়ির মতো নারকীয় সাম্প্রদায়িক হামলায় নি:শ্চুপ রয়েছেন। তাই উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদে ওয়াদুদ ভূইয়ার অপসারণের পাশাপাশি নক্ষত্র লাল দেব বর্মণেরও তার চেয়ারম্যান পদে আসীন থাকার আর কোন বৈধতা নেই।

পরে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান ও বিক্ষোভ সমাবেশ হতে আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো-

(ক) (১) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন করা।
(২) অনতিবিলম্বে অপারেশন উত্তরণসহ সকল অস্থায়ী সেনা, আনসার, এপিবি ও ভিডিপি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা;
(৩) ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের চুক্তি মোতাবেক পুনর্বাসন প্রদান করা এবং পুনর্বাসন না দেওয়া পর্যন্ত তাদের রেশন প্রদান অব্যাহত রাখা।
(৪) ইউপিডিএফ (ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট) নিষিদ্ধ করা।
(খ) (১) মহালছড়িতে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা ও এর রিপোর্ট প্রকাশ করা।
(২) হামলায় জড়িত দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
(৩) মহালছড়িতে সংঘটিত ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান ও পুনর্বাসনসহ পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করা।
(৪) জয়সেন কার্বারী পাড়া, চংড়াছড়ি ও পাকুজ্যাছড়িসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য এলাকার সেটেলার বাঙালীদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন করা।
(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী, সাম্প্রদায়িক, দুর্নীতিগ্রস্ত ও মহালছড়ি ঘটনার অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী সংসদ সদস্য আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণ করা।

সমাবেশ শেষে গাড়ী বহরের একটি র‍্যালী ওয়াদুদ ভূঁইয়ার অপসারণ ও মহালছড়ির ঘটনার বিচারের দাবীতে খাগড়াছড়ি শহর প্রদক্ষিণ করে।

অষ্ট্রেলিয়ায় জুম্মদের প্রতিবাদ সভা ও স্মারকলিপি পেশ

১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩ অষ্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত জুম্মরা মহালছড়িতে জুম্মদের উপর সেটেলারদের সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে ক্যানবেরায় অবস্থিত অষ্ট্রেলিয়াস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস এবং অষ্ট্রেলিয়া পার্লামেন্ট হাউসের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজন করে। উক্ত বিক্ষোভ সমাবেশে তারা স্থানীয় প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় সেটেলার বাঙালী কর্তৃক জুম্মদের উপর বর্বরোচিত সাম্প্রদায়িক হামলার তীব্র নিন্দা জানান। সমাবেশ শেষে তারা মহালছড়ি হামলার প্রতিবিধান চেয়ে এক স্মারকলিপি প্রদান করে।

বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দের মহালছড়ি পরিদর্শন

১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩ বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি ভদন্ত বোধিপাল মহাথেরোর নেতৃত্বে ঐক্য পরিষদের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল মহালছড়ির সাম্প্রদায়িক হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে আসেন। প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক; পরিষদের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য ইঞ্জিনিয়ার পরিমল চৌধুরী, সিরিন শিকদার, অধ্যাপক রণজিৎ রতন দেব এবং ভোরের কাগজের সাংবাদিক সমরেশ বৈদ্য। প্রতিনিধিদলটি বেলা ১২.৩০ ঘটিকায় খাগড়াছড়িতে পৌঁছার পর মহালছড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন। তারা লেমুছড়ি, বাবুপাড়া, রামেসু কার্বারী পাড়া ও স'মিল পাড়া প্রভৃতি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন শেষে অপহৃত রূপন মহাজনের পিতা বিজয় মহাজনের সাথে সাক্ষাত করেন।

খাগড়াছড়িতে ফেরার পর তারা লক্ষী নারায়ণ মন্দিরে হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত বৈঠকে মিলিত হন। যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ নিমচন্দ্র ভৌমিক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, এমন বিবেক বর্জিত নারকীয় সহিংস সাম্প্রদায়িক হামলা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। চাক্ষুস পরির্দশনে না এলে অনুমান করা কঠিন হতো। তিনি বৈঠকের মাধ্যমে বর্বরোচিত ঘটনাকে নিন্দা জানান এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেন। তারা সবচেয়ে বেশী মর্মাহত হয় লেমুছড়ির বৌদ্ধ মন্দির ও বাবুপাড়ার বৌদ্ধ মন্দির আক্রান্ত হওয়ার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে। যেখানে অহিংস মন্ত্রে উজ্জীবিত তথাগত ভগবান বুদ্ধ ও তার পূজারী ভিক্ষুগণও নির্মম সহিংসতা থেকে রেহাই পাননি - সেখানে সাধারণ লোকের অবস্থা কিরূপ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয় বলে তিনি জানান। সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জহুরুল আলম, খাগড়াছড়ি এমপি আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া, খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক ও খাগড়াছড়ি পুলিশ সুপার মহালছড়িতে অবস্থানকালে লেমুছড়ি বৌদ্ধ বিহারসহ একের পর এক বাড়ী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ও ভস্মীভূত হয়েছে বলে জানতে পেরে তাদের বাক রুদ্ধ হয়ে যায় বলে জানান।

ওয়াদুদ ভূঁইয়া গং-এর উন্মত্ত ও উস্কানীমূলক কার্যকলাপ

মহালছড়িতে জুম্মদের উপর বর্বরোচিত সাম্প্রদায়িক হামলা মূলতঃ নিরাপত্তা বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহায়তায় সেটেলার বাঙালী তথা ওয়াদুদ ভূঁইয়া গং-এর মদদে ও ষড়যন্ত্রে সংঘটিত হয়েছিল তার একের পর এক সত্য ঘটনা প্রকাশিত হচ্ছে এবং ওয়াদুদ ভূঁইয়ার উগ্র সাম্প্রদায়িক কার্যক্রম, ক্ষমতার চরম অপব্যবহার ও সীমাহীন দুর্নীতি-অনিয়মের কথা একের পর এক যখন উন্মোচিত হতে শুরু করেছে, সর্বোপরি এমনতর উগ্র সাম্প্রদায়িক, দুর্নীতিগ্রস্ত ও মহালছড়ি হামলার অন্যতম মদদদাতার পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণের দাবী বিভিন্ন মহল থেকে উত্থাপিত হচ্ছে তখন ওয়াদুদ ভূঁইয়া ও তার গং মরিয়া হয়ে উঠেছে। পায়ের তলা থেকে যখন এভাবে একের পর এক মাটি সরে যাচ্ছে তখন কখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান পদ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা সন্তু লারমার অপসারণ, কখনো বা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী পদ থেকে মণি স্বপন দেওয়ানের অপসারণের দাবী করছে। এমনকি সমগ্র পাহাড়ী জাতির বিরুদ্ধেও উস্কানীমূলক প্রচারণা করে থাকে - যা দু'একটি জাতীয় দৈনিকেও প্রকাশিত হয়েছে।

এক্ষেত্রে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩ খাগড়াছড়ি জেলা বিএনপি এবং তথাকথিত নাগরিক ফোরাম নাম দিয়ে খাগড়াছড়িতে ওয়াদুদ ভূঁইয়া গং-এর সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩ জনসংহতি সমিতির সমাবেশে সমিতির সভাপতি সন্তু লারমা কর্তৃক অন্যান্য অনেক দাবীর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী, সাম্প্রদায়িক, দুর্নীতিগ্রস্ত ও মহালছড়ি ঘটনার অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার অপসারণের দাবীর প্রেক্ষিতে উক্ত সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করা হয়। জনসংহতি সমিতির বাস্তব ও সময়োপযোগীর দাবীর প্রেক্ষিতে দিশাহারা হয়ে তার পরদিন উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ওয়াদুদ গং সন্তু লারমা ও মণি স্বপন দেওয়ানের অপসারণ, বিচার ও ফাঁসির দাবী করে। এই অযৌক্তিক দাবীর প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে তো বটেই, খোদ বিএনপি'র মধ্যেও ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়।

সাধারণ মানুষের মধ্যে আরো বেশী বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ওয়াদুদ ভূঁইয়া গং কর্তৃক ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৩ আহুত খাগড়াছড়ির জন সমাবেশ আয়োজনের পর। ওয়াদুদ ভূঁইয়া গং আগে থেকেই ঘোষণা করেছিল যে, তারা ৩০ থেকে ৫০ হাজার সমাগম করবে এবং তন্মধ্যে অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ জুম্ম সমাবেশে আনবে। কিন্তু অত্যন্ত লজ্জাকর বিষয় যে, উক্ত সমাবেশে তাঁর এক-তৃতীয়াংশ লোক তো বটেই, এমনকি সাধারণ কোন জুম্ম সমাগম করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। প্রবীন চন্দ্র চাকমা, অনিমেষ চাকমা রিংকু, অনিমেষ দেওয়ান নন্দিত, সমীরণ দেওয়ানের মতো কতিপয় চিহ্নিত সুবিধাবাদী দালাল ছাড়া কেউই উক্ত সমাবেশে অংশগ্রহণ করেনি। কারণ পাহাড়ীদের বক্তব্য হলো সন্তু লারমা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী-বাঙালী সকল স্থায়ী বাসিন্দার স্বার্থেই এসব দাবীগুলো তুলে ধরেছেন। এমনকি খোদ বিএনপি'র মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল এ কারণে যে, ১৪ সেপ্টেম্বরের সমাবেশে সন্তু লারমা সত্য কথাই বলেছিলেন বলে অনেক বিএনপি'র নেতা মনে করেন। পক্ষান্তরে ওয়াদুদ ভূঁইয়ার দুর্নীতি-অনিয়মের কথা অনেক আগেই পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। অপরদিকে সন্তু লারমা বিএনপি বা চার দলীয় জোটের বিরুদ্ধে কোন কিছুই বলেননি। ফলে যৌক্তিক কারণে খোদ বিএনপি'র একটি অংশ ওয়াদুদ ভূঁইয়া গং কর্তৃক আহুত ২১ সেপ্টেম্বরের সমাবেশ থেকে দুরে থাকে। কয়েকদিন আগে থেকেই সন্তু লারমা তথা উস্কানীমূলক প্রচারণার ফলে সমাবেশের দিনে খাগড়াছড়ি সদরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় পাহাড়ীরা চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিল। হামলার আশঙ্কায় সদর সংলগ্ন জুম্ম গ্রামগুলো থেকে মহিলা ও শিশুদের আগে থেকেই অন্যত্র সরিয়ে রাখা হয়েছিল। সেদিন সেটেলাররা সাম্প্রদায়িক ও উস্কানীমূলক শ্লোগান দিতে দিতে সমাবেশে যোগদান করেন।

সমাবেশ শেষে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে পেশকৃত স্মারকলিপিতে 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের প্রতিও জনাব সন্তু লারমার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও মন্তব্য করতে দ্বিধাবোধ করছেন না', 'গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩ অন্ত বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার কারণে জনাব সন্তু লারমা এখন অবৈধ হয়ে গেছেন', ইত্যাদি অভিযোগ এনে সন্তু লারমার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণের দাবী করা হয়। বস্তুতঃ এসব অভিযোগ ও দাবীনামা সর্বৈব ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও অন্তসারশূণ্য ছাড়া কিছুই নয় বলে ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। মহালছড়ি হামলার প্রকৃত ঘটনা আড়াল করা এবং হামলার দায়ভার থেকে রেহাই পাওয়ার লক্ষ্যে পার্বত্যবাসী তথা দেশবাসীর দৃষ্টি অন্যদিকে প্রবাহিত করার জন্যই ওয়াদুদ ভূঁইয়া গং উম্মাদের মতো এসব প্রলাপ বকে চলেছে।

সমাবেশ শেষে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে পেশকৃত স্মারকলিপিতে 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের প্রতি জনাব সন্তু লারমার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও মন্তব্য করতে দ্বিধাবোধ করছেন না', 'গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩ অন্ত বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার কারণে জনাব সন্তু লারমা এখন অবৈধ হয়ে গেছেন', ইত্যাদি অভিযোগ এনে সন্তু লারমার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণের দাবী করা হয়। বস্তুতঃ এসব অভিযোগ ও দাবীনামা সর্বৈব ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও অন্তসারশূণ্য ছাড়া কিছুই নয় বলে ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। মহালছড়ি হামলার প্রকৃত ঘটনা আড়াল করা এবং হামলার দায়ভার থেকে রেহাই পাওয়ার লক্ষ্যে পার্বত্যবাসী তথা দেশবাসীর দৃষ্টি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্যই ওয়াদুদ ভূঁইয়া গং উম্মাদের মতো এসব প্রলাপ বকে চলেছে। ইতিমধ্যে সমাবেশে সন্তু লারমার বিরুদ্ধে দেয়া অশালীন, সাম্প্রদায়িক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিত্ব।

সন্তু লারমার বিরুদ্ধে চারদলীয় ঐক্যজোটের অশালীন বক্তব্যের প্রতিবাদ

২১ সেপ্টেম্বর ২০০৩ তারিখ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার চার দলীয় ঐক্য জোটের আহুত সমাবেশে জোটের নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন অশালীন, সাম্প্রদায়িক ও ভিত্তিহীন বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানানিয়েছে খাগড়াছড়ি জেলার জনসংহতি সমিতি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

জনসংহতি সমিতির খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি প্রণতি বিকাশ চাকমা ও সাংগঠনিক সম্পাদক সুধাকর ত্রিপুরা, পিসিপির খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক বিহানু চৌধুরী (মারমা) ও সাংগঠনিক সম্পাদক উদয়ন ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির খাগড়াছড়ি সদর থানা শাখার সভানেত্রী কৃপালতা চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভানেত্রী সংগতি চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির সভাপতি বিপ্লব কান্তি ত্রিপুরা, পিসিপির খাগড়াছড়ি সদর থানা শাখার সভাপতি নিউটন মারমা ও খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজ শাখার সভাপতি তুহিন চাকমা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতি বলেন, জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা কোনভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেননি। বরং তিনি এখানকার স্থায়ী বাসিন্দাদের আইনগত ভূমি অধিকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নের কথা বলেছেন। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে

মানহানিকর কোনরূপ বক্তব্য প্রদান করেননি। শ্রী লারমার জ্ঞানগর্ব বক্তব্য যদি কোন ব্যক্তি বা মহলের অগভীর জ্ঞানের কারণে বোধগম্য না হয় অথবা উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোন কুচক্রীমহল পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করে, তাহলে তা পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা সামগ্রিকভাবে দেশের জন্য মোটেই কল্যাণ বয়ে আনবে না। মহালছড়ির সহিংস বর্বরোচিত ঘটনা কার মদদে সংঘটিত হয়েছিল, তা সকলের কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট। এই বিষয়ে দেশবাসী তথা বিশ্ববাসীর দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে দেয়া এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে মূল ষড়যন্ত্রকারীরা এই হীণ অপচেষ্টা চালাচ্ছে বলে তারা অভিযোগ করেন। তারা এই হীণ ষড়যন্ত্রকারীদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। তারা মহালছড়ির ঘটনায় জড়িত ও মদদদাতাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যও সকল গণতান্ত্রিক ও মানবতাবাদী ব্যক্তি ও সংগঠনের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন।

রাঙামাটিতে ওয়াদুদ ভূঁইয়ার অপসারণের দাবীতে সমাবেশ

২২ সেপ্টেম্বর ২০০৩ বিকাল ৫ ঘটিকার সময়ে ওয়াদুদ ভূঁইয়ার অপসারণ দাবীতে রাঙামাটি জেলা পিসিপির উদ্যোগে জনসংহতি সমিতির জেলা কার্যালয় হতে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে বনরূপা পেট্রল পাম্প চত্বরে এসে এক সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পিসিপির জেলা সভাপতি আসীন চাকমা। এতে বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির রাঙামাটি জেলার সাধারণ সম্পাদক পলাশ খীসা, পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি উজ্জ্বল চাকমা, সাধারণ সম্পাদক বিনোতাময় ধামাই ও রাঙামাটি জেলার সাংগঠনিক সম্পাদক নিকো চাকমা। সমাবেশ পরিচালনা করেন পিসিপির জেলা সাধারণ সম্পাদক টুলু মারমা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন যে, ওয়াদুদ ভূঁইয়া একজন বহিরাগত বাঙালী ও পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা নয়। সে অবৈধভাবে উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে আসীন হওয়ার পর থেকে নানাবিধ দুর্নীতি ও অপকর্ম করে চলেছে। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি সে মহালছড়ির মতো নারকীয় সাম্প্রদায়িক হামলা সৃষ্টি করেছে। সমাবেশ শেষে শত শত মানুষ ওয়াদুদ ভূঁইয়ার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে তার একটি কুশপুত্তলিকা দাহ করে।

উপজাতীয় সামাজিক ফোরামের নিন্দা প্রকাশ

মহালছড়িতে পাহাড়ীদের বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ, হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, লুঠতরাজসহ একতরফা সাম্প্রদায়িক ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে উপজাতীয় সামাজিক ফোরাম। গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩ ফোরামের সভাপতি সুবিমল দেওয়ান ও সাধারণ সম্পাদক সুকুমার দেওয়ান এর স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, 'বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন চার দলীয় ঐক্য জোট সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বৈঠক শুরু করার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী ও স্থায়ী বাঙ্গালী অধিবাসীদের মধ্যে আশার সঞ্চার হলেও মহালছড়ির ঘটনার কারণে তাতে চিঁড় ধরেছে। খাগড়াছড়ির সাংসদ জনাব আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াসহ স্থানীয় সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা মহালছড়ি সদরে অবস্থান করা সত্ত্বেও কিভাবে মহালছড়ি সদর সংলগ্ন এলাকা হতে শুরু করে দুরবর্তী গ্রাম লেমুছড়ি ও নোয়াপাড়া পর্যন্ত অগ্নিসংযোগ ও লুঠপাটসহ সংঘবদ্ধ হামলা বিস্তৃতি লাভ করতে পারে তা আমাদের বোধগম্য নহে। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পাহাড়ী অধ্যুষিত গ্রামে একতরফা সাম্প্রদায়িক ঘটনার সৃষ্টি করা হয়েছে। সাংসদ জনাব ভূঁইয়ার রহস্যজনক ভূমিকার কারণে পরিস্থিতি অবনতি হয়েছে।'

পার্বত্য চট্টগ্রামে যাতে আর এধরণের ঘটনা না ঘটে তার জন্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করে তারা সাম্প্রদায়িক ঘটনার তদন্তের জন্য অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন, ঘটনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিদের আইনানুগ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের পুনর্বাসনের জন্য কমপক্ষে ১ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ নিরাপত্তা প্রদান, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের ১ বছরের জন্য রেশন প্রদান ও ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বই সরবরাহ করার দাবী জানিয়েছে।

প্রজন্ম চেতনার মানব বন্ধন

২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩ প্রজন্ম চেতনা'র উদ্যোগে ঢাকাস্থ জাতীয় যাদুঘরের সামনে মহালছড়িতে জুম্মদের উপর বর্বরোচিত সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে এক মানব বন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়। এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারীরা মহালছড়ি ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত চাই, মহালছড়িতে শিশু হত্যার বিচার চাই, আদিবাসী নারী ধর্ষণের বিচার চাই প্রভৃতি শ্লোগান সম্বলিত পোষ্টার বুকে ঝুলিয়ে প্রতিবাদ জানান।

স্থায়ী বাঙালী কল্যাণ পরিষদের নিন্দা

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপমন্ত্রী শ্রী মণি স্বপন দেওয়ানের অপসারণ, বিচার ও ফাঁসির দাবীর বিরুদ্ধে ২৪ সেপ্টেম্বর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সংগঠনের সভাপতি মোঃ জাকের হোসেন, সহসভাপতি মোঃ মফিজুর রহমান ও সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইউসুফ নিন্দা জানিয়েছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৩ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার চার দলীয় ঐক্য জোটের আহুত সমাবেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন নেতার বক্তব্যকে কতিপয় ব্যক্তির উক্ত সাম্প্রদায়িক, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দাবী ও অভিযোগ বলে অভিহিত করা হয়। তাই তারা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া প্রসঙ্গে বলা হয় যে, ১৯৯৭ সনে স্বাক্ষরিত পার্বত্য শান্তিচুক্তিতে উল্লেখ আছে যে, পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান অন্তবর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব পালন করবেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। যিনি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের সাথে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেছেন এবং শান্তিচুক্তি মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁর ফাঁসি বা অপসারণের দাবী করা শান্তিচুক্তি তথা সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার সামিল বলে স্থায়ী বাঙালী কল্যাণ পরিষদ মনে করে। পরিশেষে শান্তিচুক্তি অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়ার জন্য স্থায়ী বাঙালী কল্যাণ পরিষদের পক্ষ থেকে সরকারের নিকট জোর দাবী জানানো হয়।

মহালছড়ি হামলা বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সচিবের দায়িত্ববর্জিত বক্তব্য

২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩ খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব সৈয়দ মোশতাক বলেছেন যে - মহালছড়ি ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের প্রয়োজন নেই। মহালছড়ি ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির দাবী একটি রাজনৈতিক দাবী। প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের প্রয়োজন নেই। কারণ এই ঘটনায় সরকারের কোন এজেন্সী বা বাহিনী জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তিনি আরো বলেছেন যে, মহালছড়ির ঘটনা দুঃখজনক, তবে এই ঘটনাটি ঘটেছে দু'টি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে।

দু'টি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ঘটনা সংঘটিত হলে বা ঘটনায় সরকারের কোন এজেন্সী বা বাহিনী জড়িত না থাকলে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা থাকে না - এ ধরনের উদ্ভট বক্তব্য সরকারের একজন উর্ধতন কর্মকর্তা থেকে পার্বত্যবাসী কখনোই আশা করেনি। কেননা সরকারের কোন এজেন্সী বা বাহিনী জড়িত থাকার কারণে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী করা প্রধান কারণ নয়। প্রধান কারণ হচ্ছে নিরপেক্ষ ও ন্যায্য বিচার পাওয়ার জন্যই মানুষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করে থাকে। আরো উল্লেখ্য যে, এই ঘটনায় সরকারের কোন এজেন্সী বা বাহিনী জড়িত ছিল না - এটা তদন্ত না করে তিনি কিভাবে প্রমাণ পেলেন তা পার্বত্যবাসীর নিকট বোধগম্য নহে। যারা হামলার প্রত্যক্ষ শিকার তারাই স্পষ্টভাবে অভিযোগ করছেন যে, জুম্মদের বাড়ীঘরে হামলা, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, হত্যা ও লুঠপাট চলাকালে সেনাবাহিনী, সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক। হামলা চলাকালে স্থানীয় পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসন এগিয়ে আসেনি। অপরদিকে সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে সেটেলাররা বাবুপাড়া, কেরেঙ্গ্যানাল, দুরপর্য্যানাল, স'মিল পাড়া, পাহাড়তলী, লেমুছড়ি, ভূয়াটেক, হেমন্ত কার্বারী পাড়া, থলি পাড়া, রামেশু কার্বারী পাড়া ও চংড়াছড়ি মুখ প্রভৃতি এলাকায় হামলা চালায়।

আরো উল্লেখ্য যে, মহালছড়ি ঘটনা সরেজমিন পরিদর্শনে আসা সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, আওয়ামী লীগের সংসদীয় দল, ১১ দলের প্রতিনিধিদল, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, ব্লাষ্ট, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি, জাতীয় পার্টি, পার্বত্য ভিক্ষু সংঘ-বাংলাদেশ, বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদের প্রতিনিধিদলের কাছে ক্ষতিগ্রস্তরা হামলায় সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্টতার কথা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন এবং সরেজমিন পরিদর্শনে আসা বিভিন্ন প্রতিনিধিদল ও ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীসহ সকল মহল থেকে ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী উত্থাপিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব উগ্র সাম্প্রদায়িক, দায়িত্বজ্ঞানশূণ্য ও পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী না হলে একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এমন উদ্ভট ও মানবতা বিরোধী বক্তব্য দিতে পারে না বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে। তিনি বিনা তদন্তে সেনাবাহিনীর সাফাই গেয়ে তাদের অপকর্মকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা চালিয়েছেন বলে সচেতন মহল মনে করে।

বান্দরবানে জনসংহতি সমিতির বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা শাখার উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার অপসারণের দাবীতে বান্দরবান প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির জেলা শাখার সহ সভাপতি জলি মং মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য প্রদান কে এস মং মারমা, সমিতির জেলা শাখার সহ-সভাপতি লয়েল ডেভিড বম, সমিতির জেলা শাখার সদস্য ওয়াইচিং প্রু মারমা, সমিতির বান্দরবান সদর থানা শাখার সভাপতি উছোমং মারমা, পিসিপি জেলা সভাপতি পুশৈথোয়াই মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক থুইম্রানু মারমা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। বক্তারা ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণ না করলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অচল করে দেয়ার হুমকি দেন।

ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নাগরিক সমাবেশ

২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩ ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সচেতন নাগরিক সমাজের উদ্যোগে মহালছড়িতে জুম্ম গ্রামে হামলার প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল আয়োজন করা হয়। গণ ফোরামের অন্যতম নেতা পংকজ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ওয়াকার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, ওয়াকার্স পার্টির পুলিটব্যুরো সদস্য হায়দর আকবর খান রনো, সিপিবি'র সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, জাসদের হাসানুল হক ইনু, ভাষা সৈনিক আবদুল মতিন, বজলুর রহমান, ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার, নাট্যকার মামুনুর রশিদ, নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের নেত্রী রেখা চৌধুরী, বাসদের রশিদ ফিরোজ, সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি

এ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, পার্বত্য ভিক্ষু সংঘের সভাপতি সুমনালঙ্কার ভিক্ষু, জনসংহতি সমিতির সহ সাধারণ সম্পাদক তাতিন্দ্র লাল চাকমা ও সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরাসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ। সমাবেশে ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা, ক্ষতিগ্রস্ত দের সাধারণ প্রশাসনের মাধ্যমে যথাযথ পুনর্বাসন, দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার অপসারণের দাবী করা হয়।

জাতীয় পার্টির মহাসচিবের দুঃখ প্রকাশ

২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩ জাতীয় পার্টি(এরশাদ) এর মহাসচিব এবিএম রুহুল আমিন এক বিবৃতিতে মহালছড়ি ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সমবেদনা জানান। জাতীয় পার্টির সংসদীয় প্রতিনিধিদল মহালছড়ি সরেজমিন ঘুরে এসে যে প্রতিবেদন পেশ করেছেন তাতে ঘটনার বর্বরতা দেখে তিনি ব্যথিত হন। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, জাতীয় পার্টি এই ঘটনায় মর্মাহত ও বিস্মিত হয়েছে।

মহালছড়ি হামলায় অসহায় লোকজন

সংবাদপত্র ও মহালছড়ি ঘটনা

তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক অগ্রগতি, সাথে সাথে তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং সংবাদ মাধ্যমের প্রভূত উন্নতি ও প্রসারের ফলে বর্তমান যুগকে বলা হয় তথ্য প্রযুক্তির যুগ। কেননা তথ্যই হচ্ছে জ্ঞানের ভিত্তি; সেই জ্ঞান মঙ্গলার্থে হোক বা অমঙ্গলার্থে হোক আর এই জ্ঞানই সমাজ, রাজনীতি ও রাষ্ট্রের অনেক কিছু প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রন করে। তাই একটা দেশের সংবাদ মাধ্যমের অগ্রগতি এবং তার মানের উপরও সেই দেশের গণতান্ত্রিক উন্নতি এবং সংস্কৃতির মানের খবর পাওয়া যায়। '৯০ এর পর বাংলাদেশেও সংবাদ মাধ্যমের ব্যাপক প্রসার এবং উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে সংবাদপত্রে সাহসী ও বিবেকবান সাংবাদিকতার একটা উত্থান পরিলক্ষিত হয়। এ সময় থেকেই দেশের বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক খবরও প্রকাশের সুযোগ পায়। এর পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের খবর মানে সরকারের বা সেনা কর্মকর্তাদের একপেশে খবর। ফলে '৯০ এর পর বেশ কিছু সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকরা হয়ে দাঁড়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ ও পার্বত্য সমস্যা সমাধানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী এবং বিবেক।

গত ২৬ আগষ্ট ২০০৩ইং প্রকাশ্য দিবালোকে মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে মহালছড়িতে পাঁচ মৌজার ১৪টি গ্রামের সাড়ে ৩ শতাধিক জুম্ম বাড়ীতে পর পর যে অগ্নিসংযোগ, অত্যাচার, নারী ধর্ষণ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে তা নজিরবিহীন। আরো নজিরবিহীন হচ্ছে এই ঘটনা ঘটার দুই-তিন দিনেও দেশের সংবাদপত্রগুলিতে এর সঠিক খবর প্রকাশিত না হওয়া অথবা অত্যন্ত গুরুত্বহীনভাবে স্থান পাওয়া অথবা বাস্তব ঘটনার সাথে সঙ্গতিহীনভাবে প্রকাশিত হওয়া। যদিও পরবর্তীতে বেশ কিছু সংবাদপত্র এগিয়ে আসে এবং ঘটনাটি আর চাপা থাকেনি। তবে এতেও অনেক সংবাদপত্রের সংবাদে প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত করবার এবং আড়াল করবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে। যা সমাজের দর্পন ও বিবেকবৃত্তি বলে পরিচিত সাংবাদিকতার নামে কলঙ্ক।

ঘটনার পরের দিনের সংবাদপত্র

মহালছড়ি ঘটনাটি ২৬ আগষ্ট সকাল ৯টা / ১০টা হতে একেবারে দিনের মধ্যভাগে সংঘটিত হলেও, ঘটনাটি অত্যন্ত নৃশংস হলেও এবং ঘটনাটি সেদিনের দেশের অন্যান্য যে কোন খবরের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলেও এর পরের দিনের সংবাদপত্রগুলিতে তা গুরুত্ব সহকারে পরিবেশিত হয়নি। যেটুকু পরিবেশিত হয়েছে তাও নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ট হয়নি এবং প্রকৃত ঘটনা বেরিয়ে আসেনি। শুধু সেদিন নয় এর পরে তিন/চার দিনের খবরেও রয়েছে সত্যের ব্যাপক ঘাটতি।

দেখা যায়, ২৭ আগষ্ট প্রকাশিত 'প্রথম আলো', 'দৈনিক যুগান্তর', 'দৈনিক জনকণ্ঠ' ও 'দৈনিক ইনকিলাবে' সংবাদের শিরোনাম করা হয়েছে 'পাহাড়ী-বাঙালী সংঘর্ষ' বলে। পত্রিকাগুলিতে সংবাদটি মোটামুটি জায়গা পেলেও, দুই হতে তিন কলাম বরাদ্দ পেলেও কোন পত্রিকাতেই লিড নিউজ হিসেবে আসেনি। অপরদিকে The Daily Star পত্রিকায়ও বাসস এর বরাত দিয়ে সংবাদের শিরোনাম করা হয়েছে- '..clashes over kidnap' এবং সূচনাতে উল্লেখ করা হয়েছে `..clashes between two groups over abduction of a businessman..' (অর্থাৎ 'একজন ব্যবসায়ী অপহরণকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের সংঘর্ষ')। এতে সংবাদটি স্থান পেয়েছে মাত্র এক কলামে। আর 'দৈনিক ইত্তেফাক' এ সংবাদের শিরোনাম করা হয়েছে 'মহালছড়িতে অপহরণের জের। ২ গ্রামে ১২৫টি বাড়ী ও বৌদ্ধ মন্দিরে আগুন'। আঞ্চলিক পত্রিকা বিধায় দৈনিক কর্ণফুলী' তে একটু বড় করে শিরোনাম করা হয়েছে 'মহালছড়িতে উত্তেজনা: সংঘর্ষে নিহত ১ আহত ১০: শতাধিক বাড়ীতে আগুন উত্তেজনা প্রশমনে বৈঠক: আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়ার আহ্বান'।

ইতিমধ্যে যারা মহালছড়ির প্রকৃত ঘটনা জেনেছেন এবং সত্যকে ভিত্তি করে যারা নিরপেক্ষভাবে ঘটনার খোঁজ নিয়েছেন তারা যদি আজ উপরোক্ত পত্রিকাগুলোর শিরোনামগুলো একটু চোখ বুলিয়ে দেখেন তাহলে সহজেই বুঝতে পারবেন যে সেদিনের সেই সংবাদপত্রগুলো ঘটনার বস্তুনিষ্ট, নিরপেক্ষ ও সত্য খবর প্রকাশে কতটা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। ঘটনার রূপ এবং ফলাফল বিশ্লেষণ করলেও মোটেও তা 'পাহাড়ী-বাঙালী বা দুই গ্রুপের সংঘর্ষ' বলে বর্ণনা করা যায়না। বরং সেটেলার বাঙালীরাই একতরফাভাবে সাধারণ জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা চালায়। যে কারণে কয়েক মাইলব্যাপী ৫টি মৌজার ১৪টি গ্রামের ৩ শতাধিক জুম্ম ঘরবাড়ী বাঙালীদের দ্বারা ভস্মীভূত হয়, লুটপাট হয়, ৯ জন জুম্ম নারী ধর্ষণের শিকার হয়। যে কারণে জুম্মদের কর্তৃক কোন বাঙালীর ঘরবাড়ীতে অগ্নিসংযোগ বা কোন বাঙালী নারী ধর্ষিত হওয়ার খবর পাওয়া যায়না। আর ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে সেটেলারদের কর্তৃক এই একতরফা হামলা সম্ভব হয়েছিল সেনাবাহিনীর সদস্যদেরই প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। সংবাদগুলিতে প্রকাশিত ক্ষতির পরিমানের সাথেও বাস্তবের ক্ষতির পরিমাণে রয়েছে বিস্তর তফাত। বাস্তব ক্ষতির এক-তৃতীয়াংশও সংবাদগুলিতে উল্লেখ করা হয়নি। কোন কোন পত্রিকায় অগ্নিসংযোগের শিকার হিসেবে চারটি গ্রাম আবার কোনটিতে মাত্র দুটির কথায়ই উল্লেখ

করা হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ীর সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র শতাধিক। অপরদিকে ৯ জন জুম্ম নারী ধর্ষিত হলেও কোন ধর্ষণের খবরই সংবাদে আসেনি। ফলে সংবাদগুলি হয়েছে একেবারে দায়সারা।

সাথে সাথে এই প্রশ্নটিও সঙ্গত যে, তারা কি কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন নাকি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই এই দায়সারা সংবাদ ছেপেছেন? অথবা তারা কোন সোর্সের ভিত্তিতে এই খবর প্রকাশ করেছেন? আর মহালছড়ি উপজেলা ও খাগড়াছড়ি জেলার সরকারের সিভিল ও সেনা প্রশাসন কি ঘটনাটা জানত না? তাদের তো না জানবার কোন যুক্তিই নেই। তারা কেন সঠিক ঘটনাটি জানাননি? নাকি তারা সুপরিকল্পিতভাবেই সঠিক ঘটনাটি জানাননি অথবা কোন না কোন ভাবে সঠিক ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেছেন?

এর পরবর্তী কয়েকদিন

আসলে ২৭ আগষ্ট এর পরবর্তী চার দিনের খবরেও আমরা মহালছড়ি ঘটনার ব্যাপারে তেমন বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ খবরের সন্ধান পায়না। মনে হয় যেন কেবল ভারসাম্য রক্ষা করে জোড়াতালি দিয়েই খবরটা পরিবেশন করা। এর মধ্যে 'মহালছড়ি এখনও অশান্ত 'মহালছড়িতে সংঘর্ষ ঘটনায় ৩৯ বাঙালীকে সেনা বাহিনী গ্রেফতার করেছে', 'মহালছড়ি থমথমে। সেনাটহল চলছে' '৪৭ বাঙালী ১০ পাহাড়ী গ্রেফতার' আবার কোনটাতে 'মহালছড়ি শান্ত' ইত্যাদি সাদামাটা শিরোনামে গতানুতিক খবরই সংবাদগুলিতে প্রকাশ করা হয়। অপরদিকে যুগান্তরে 'বান্দরবানে ইউনিফরম পরা উপজাতি সন্ত্রাসীদের পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্তি', প্রথম আলোর সম্পাদকীয়তে 'বান্দরবানে হচ্ছেটা কি', একই বিষয়ে সংবাদে সম্পাদকীয় 'পাহাড়ে ফের অশান্তির ছায়া' সংবাদ-'রক্তছড়ির দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে ব্যবসায়ী জামালউদ্দিনকে রাখা হয়েছে', দৈনিক ইনকিলাবে 'পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী দল-উপদলগুলো চালাচ্ছে খুন-অপহরণ ও চাঁদাবাজির প্রতিযোগিতা'- এ জাতীয় সংবাদগুলো অনেক গুরুত্ব সহকারে স্থান পেয়েছে। ফলে এ কয়দিনে মহালছড়ি ঘটনার ব্যাপারে সংবাদপত্রগুলোর ভূমিকার ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মরা এবং সচেতন পাঠকরা অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েন।

৭ দিন পরেও সেনাসদস্যদের সাংবাদিকের ক্যামেরা সিজ করার হুমকী!

দৈনিক জনকণ্ঠ সূত্রে আমরা জানি, ঘটনার সাত দিন পর ৩ সেপ্টেম্বর ঢাকার একদল সাংবাদিক মহালছড়িতে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান। এই সাংবাদিকদের দলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও লেখক মেসবাহ কামালও অংশগ্রহণ করেন। ঘটনাস্থলে মহালছড়ির ব্যাপারে আলাপ করতে গেলে সেনাবাহিনীর এক মেজর অনর্থকভাবে তর্জনী উঁচিয়ে শাসিয়ে অধ্যাপক মেসবাহ কামালকে বলেন, 'চোখ রাঙিয়ে কথা বলবেন না'। সাথে সাথে সেই মেজর রহস্যজনক রাগে কেঁপে কেঁপে তার জোয়ানদের আদেশ দেয় যে, 'সাংবাদিকদের ক্যামেরা সব সিজ করো। এখানে কেউ ভিডিও করতে পারবেনা'। এসময় তৎস্থলে ঘটনাস্থল পরিদর্শনরত বৌদ্ধধর্মীয় গুরু এক ভান্তেকেও সেনা সদস্যরা ধমকের সুরে বলে যে, 'খবরদার, এখানে ছবি তোলার চেষ্টা করবেন না। ভিডিও করবেন না'। মেজরের এই আচরণ ও বক্তব্যে সাংবাদিকসহ সেখানে উপস্থিত সবাই বিশ্ময়ে হতবাক হয়ে যান।

এখানে একদল সেটেলার কর্তৃক পাহাড়ীদের শত শত বাড়ী-ঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, লুটপাট করা হয়েছে এবং ঘটনার আটদিন হয়ে গেছে অথচ সেনাসদস্যরা ঘটনার ছবি তুলতে বা ভিডিও করতে দিচ্ছে না। কেন? কারণ কি? তারা কি ঘটনার ছবিকে ভয় পায়? তারা কার নির্দেশে, কার স্বার্থে, কোন যুক্তিতে বাস্তব ঘটনার ছবি তুলতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তারা কি ঘটনার সত্যতা প্রকাশ বা প্রচারকে ভয় পায়? আসলে সেনাসদস্যদের এই আচরণ ও ঘটনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মহালছড়ি ঘটনার পেছনে তাদের জঘন্য কীর্তি।

মহালছড়িতে চলেছে নির্মম বর্বরোচিত অত্যাচার

আসলে কেবল সেপ্টেম্বরের শুরু থেকেই বেশ কিছু সংবাদপত্রের সংবাদের মধ্য দিয়ে ঘটনাটির গুরুত্ব এবং নৃশংসতা কিছুটা প্রকাশ পেতে থাকে। এ সময় বিভিন্ন মহল থেকে ঘটনার নিন্দা, প্রতিবাদ, বিচার বিভাগীয় তদন্ত, দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবী ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের দাবী প্রকাশ পেতে শুরু করে। এবং এসময় থেকে সরকার ও প্রশাসনেরও কিছুটা টনক নড়ার খবর প্রকাশ পায়। 'মহালছড়ির প্রকৃত ঘটনা উদঘাটনে সরকার কর্তৃক সাব-কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত', 'মহালছড়িতে সংসদীয় প্রতিনিধিদল'এর গমনের সিদ্ধান্ত, 'মহালছড়িতে আইন-শৃংখলা রক্ষায় ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ' ইত্যাদি খবর পাওয়া যায়।

তবে ৪ সেপ্টেম্বর দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত 'মহালছড়িতে পাহাড়ী গ্রামগুলোতে ২৬ আগষ্ট চলেছে নির্মম বর্বরোচিত অত্যাচার' শিরোনামের সংবাদটিতেই সর্বপ্রথম মহালছড়ি ঘটনার প্রকৃত ও আসল রূপটি প্রকাশ পায়। ঘটনাস্থলের চাক্ষুস প্রতিবেদক বিশিষ্ট সাংবাদিক ফজলুল বারী তাই যথার্থই লিখেছেন, 'নির্মম! অকথ্য! বর্বরোচিত! খাগড়াছড়ির মহালছড়ির উপদ্রুত পাহাড়ী গ্রামগুলোতে ঘুরে বেড়াবার সময় বার বার এ শব্দগুলোই মনে এসেছে'। জনকণ্ঠের পাশাপাশি সে দিনের প্রথম আলোতেও ঘটনার প্রকৃত রূপটি ফুটে উঠে। এ দিন প্রথম আলোর শিরোনাম করা হয় 'মহালছড়ির ৯ পাহাড়ী গ্রাম বিরানভূমি, ৩৫০ পরিবার জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে'। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, 'মহালছড়ির ৯ গ্রাম এখন বিরানভূমি। গত ২৬ আগষ্ট স্থানীয় বাঙালীদের হামলা থেকে শুধু

বাড়ীঘর নয়, ধর্মীয় তীর্থস্থানও বাদ পড়েনি'। সেনাসদস্যরা যে এই হামলায় মদত দিয়েছে, সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছে তাও রিপোর্টগুলোতে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। এদিনের `The Daily Star'এর `Ethnic villagers live under spectre of fear-over 1,500 live in the open' এবং দৈনিক সংবাদের 'মহালছড়ির ঘটনা। পরিস্থিতি উত্তরণ কার্যক্রমে সমন্বয় নেই' শিরোনামের সংবাদগুলিও অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। এর পরবর্তী পর পর জনকন্ঠের 'মহালছড়ির অসহায় মানুষ এখনও দুর্গম জঙ্গলে খোলা আকাশের নীচে', 'জন্মভূমিতে কি থাকতে পারবনা, প্রশ্ন পাহাড়ীদের', 'মহালছড়িতে ভীতির মধ্যে বসবাস!' ইত্যাদি শিরোনামের সংবাদগুলিও অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। ৫ সেপ্টেম্বর 'ভোরের কাগজ'ও এই বিষয়ে 'মহালছড়িতে সর্বত্র আতঙ্ক। শূন্যভিটায় আগুন লুটপাটের ছাপ। ধর্ষিতাদের কান্না থামছে না' শিরোনামের সংবাদটি গুরুত্ব দিয়ে ছেপেছে। বস্তুতঃ উল্লিখিত সংবাদগুলির মধ্য দিয়ে পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, মহালছড়ির ঘটনাটি আদৌ সাদামাটা ঘটনা নয়, আদৌ পাহাড়ী-বাঙালী বা দুই গ্রুপের গতানুগতিক কোন সংঘর্ষ নয়। সেখানে যে নিরীহ পাহাড়ীদের উপর সেটেলার বাঙালী ও কতিপয় ব্যবসায়ীদের কর্তৃক একতরফাভাবে হামলা চলেছে, শত শত পাহাড়ী বাড়ীতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ চলেছে এবং পাহাড়ী নারী ধর্ষণ চলেছে তা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠে। আর এটা যে সাধারণ নয়, বরং বড় আকারের মানবিক বিপর্যয়কর এক ঘটনা তা অবিসংবাদিতভাবে প্রকাশ পায়। অপরদিকে ঘটনাস্থলের পাশেই সেনা ও পুলিশক্যাম্প থাকা অবস্থায় সেনাবাহিনী, পুলিশবাহিনীর সহযোগিতা বা যোগসাজস ছাড়া যে এত বড় ঘটনা বর্তমান দিনে সম্ভব নয় তাও মানুষের কাছে আর অজানা থাকেনি।

আবার সাথে সাথে আলোর পাশাপাশি অন্ধকারের মত 'দৈনিক ইনকিলাব' সহ বেশ-কিছু পত্রিকায় ভয়ঙ্কর মিথ্যাশ্রয়ী, বানোয়াট এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করা হয়। তাতে পত্রিকাগুলোর নিম্নমান ও সাংবাদিকদের নিচু মানসিকতার প্রকাশ পায়। ঘটনার প্রকৃত রূপ তুলে না ধরে বরং ঘটনাকে ভিন্ন উদ্দেশ্যে পরিবেশন করে ৪ সেপ্টেম্বরে দৈনিক ইনকিলাবের সংবাদ শিরোনাম হচ্ছে 'খাগড়াছড়ি পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করতে উগ্রপন্থী উপজাতীয়দের উস্কে দেয়া হচ্ছে' 'কলকাঠি নাড়ছেন বিভিন্ন পদে আসীন উপজাতীয় নেতারা'।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমসার সমাধানে সংবাদপত্র বস্তুনিষ্ট ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করুক- এটা পার্বত্য চট্টগ্রামের আপামর জনাসাধারণের একান্ত প্রত্যাশা। ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে যখন 'মহালছড়ির কান্না' নামে একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছিল তাতে "বাই আশা করেছিল তার ভিত্তিতে দেশের বিবেকবান, গণতন্ত্রমনা, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল মানুষ তথা বুদ্ধিজীবীমহল তাদের বিবেককে জাগ্রত করবেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ এখানকার সমস্যার স্থায়ী সমাধানে বুদ্ধিজীবীদেরসহ সকল স্তরের মানুষের বিবেক জাগ্রত করাতে সংবাদপত্রের সঠিক, নিরপেক্ষ ও বস্তনিষ্ঠ ভূমিকা কামনা করে।

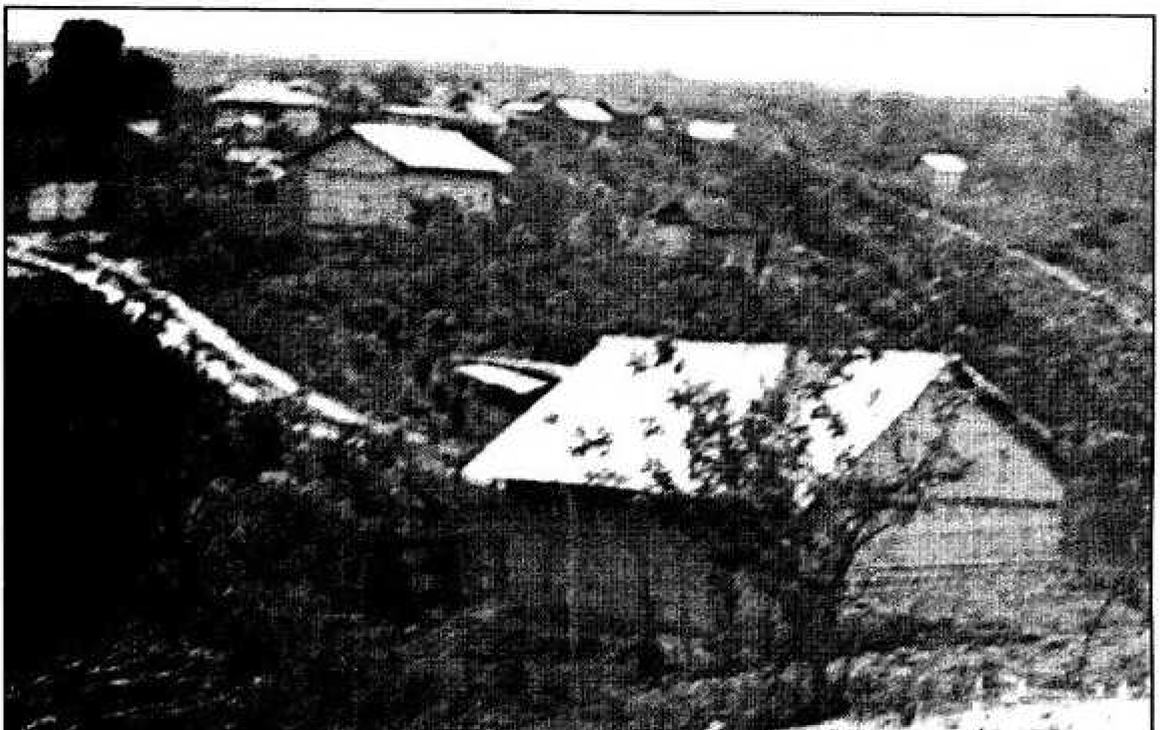

জয়সেন পাড়ায় জুম্মদের ভূমি বেদখল করে সেটেলারদের নির্মিত দু'শতাধিক বাড়ীর একাংশ

'মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চালু এবং উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাহাড়ী কোটার দাবী'তে পিসিপির মিছিল, সমাবেশ ও স্মারকলিপি পেশ

১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ তিন পার্বত্য জেলায় শিক্ষা দিবস উপলক্ষ্যে মিছিল ও স্মারকলিপি পেশ করা হয়। 'মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা এবং উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ৫% পাহাড়ী কোটা চালুর দাবী'তে এই দিবসটি পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে ঢাকা মহানগর শাখা কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য দেন সংগঠনের সভাপতি উজ্জ্বল চাকমা, বাগাছাস এর নেতা উজ্জ্বল আজিম প্রমুখ। চট্টগ্রামে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম মহানগর শাখার উদ্যোগে কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রচার সম্পাদক আনন্দজ্যোতি চাকমার সভাপতিত্বে শহীদ বুদ্ধিজীবী চত্বরে মিছিল শেষে এক সমাবেশ আয়োজন করা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাংস্কৃতিক সম্পাদক চঞ্চু চাকমা, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি রেবতী চাকমা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ-সভাপতি সুখেন চাকমা, মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক কনিষ্ক চাকমা এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশনের দপ্তর সম্পাদক মিমিচিং মারমা প্রমুখ। রাঙামাটিতে জেলা শাখার উদ্যোগে একটি মিছিল ও সমাবেশ আয়োজন করা হয়। মিছিলটি জেলা কার্যালয় হতে আরম্ভ হয়ে জেলা প্রশাসকের অফিস প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। তারপর আয়োজিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পিসিপি জেলা সভাপতি আসীন চাকমা এবং আরও উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির রাঙামাটি জেলার সহ সাধারণ সম্পাদক বোধিসত্ত্ব চাকমা, পিসিপির সাধারণ সম্পাদক বিনোতাময় ধামাই, কেন্দ্রীয় সদস্য বীরোত্তম তঞ্চঙ্গ্যা প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন নিকো চাকমা, দপ্তর সম্পাদক, রাঙামাটি জেলা পিসিপি।

বান্দরবানে আয়োজিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলার সভাপতি পুশৈথোয়াইং মারমা। রাজবাড়ী মাঠের সন্নিকটে বটতলায় আয়োজিত এ সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সাধারণ সম্পাদক খোকন বিকাশ ত্রিপুরা, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মংসিংঞো মারমা , জেলার সাংগঠনিক সম্পাদক অংচউ মারমা, কলেজ শাখার জুলি মং মারমা এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক থুইয়ানু মারমা ও জেলার সাধারণ সম্পাদক এচিং প্রু মারমা। খাগড়াছড়িতে আয়োজিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলার সভাপতি ছাত্রনেতা কাঁকন চাকমা। এতে বক্তব্য প্রদান করেন কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক চিরঞ্জীব চাকমা, জেলার সাধারণ সম্পাদক উদয়ন ত্রিপুরা, জেলা কমিটির সহসাধারণ সম্পাদক প্রত্যয় চাকমা, কলেজ কমিটির সভাপতি তুহিন চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের অর্থ সম্পাদক পরানী চাকমা।

পিসিপির রাঙামাটি জেলা শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত

অপরেশন উত্তরণসহ সকল অস্থায়ী সেনাক্যাম্প, আনসার এপিবি, ভিডিপি ক্যাম্প প্রত্যাহারের দাবী জানিয়ে গত ২০-২১ দুদিনব্যাপী পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাঙামাটি জেলা শাখার ৮ম বার্ষিক শাখা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে ২০ সেপ্টেম্বর আসীন চাকমার সভাপতিত্বে জেলা শিল্পকলা একাডেমী প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী সভায় উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির রাজনীতি বিষয়ক সম্পাদক শ্রী উষাতন তালুকদার। এতে আরও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি শ্রী উজ্জ্বল চাকমা, মহিলা সমিতির নেত্রী সুপ্রভা চাকমা ও রাঙামাটি জেলার জনসংহতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক পলাশ খীসা। সম্মেলন শেষে আসীন চাকমাকে সভাপতি, টুলু মারমাকে সাধারণ সম্পাদক ও নিকো চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

রাঙামাটিতে মহিলা সমিতির থানা সম্মেলন সম্পন্ন

১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩ জনসংহতি সমিতির রাঙামাটি জেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি রাঙামাটি সদর থানার এক কর্মীসভার মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। ১৫ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে যুথিকা চাকমা ও রমা চাকমা। নতুন কমিটি গঠনের সময়ে প্রধান অতিথি হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রী চন্দ্রশেখর চাকমা উপস্থিত ছিলেন। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির অর্থ সম্পাদক সত্যবীর দেওয়ান, রাঙামাটি জেলার সভাপতি গুনেন্দু বিকাশ চাকমা, মহিলা সমিতির সভাপতি মাধবীলতা চাকমা ও অর্থ সম্পাদক কল্পনা চাকমা প্রমুখ। মহিলা সমিতির সভাপতি মাধবীলতা চাকমা সভায় সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন যে, জুম্ম নারীরা যুগ যুগ ধরে পুরুষের শাসন শোষণে জর্জরিত। তার সাথে বিজাতীয় সাম্প্রদায়িক শাসন শোষণ জুম্ম সমাজকে বিপন্ন করে তুলেছে। তাই নারী সমাজকে প্রগতিশীল চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সংগঠিত হতে হবে।

জাতীয় সরকার গঠনে ঐক্যবদ্ধ হউন - গণফোরামের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে সন্তু লারমা

২৮ আগস্ট ২০০৩ ঢাকায় বাংলাদেশ গণফোরামের ১০ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা যোগদান করেন। এ উপলক্ষ্যে সকাল ১১টায় ঢাকার নাট্যমঞ্চে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ড. কামাল হোসেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি কমরেড রাশেদ খান মেনন, সিপিবির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, জাতীয় কৃষক লীগের নেতা কাদের সিদ্দিকী প্রমুখ।

সন্তু লারমা তার ভাষণে বলেন যে, ১৯৭২ সালের সংবিধানের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নিয়ে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, আদিবাসীরা মুক্তিযুদ্ধসহ এদেশের সকল আন্দোলনে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে তাই এক্ষেত্রেও আদিবাসীদের ভূমিকা অপরিহার্য। সভায় সরকারের দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় এবং সবাইকে এসকলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানানো হয়।

'পার্বত্য চট্টগ্রামে ঐতিহ্যবাহী নেতৃত্ব অত্যন্ত সংকটময় ও জটিল অবস্থায় বিরাজ করছে' - সন্তু লারমা

জাবারাং কল্যাণ সমিতির 'পার্বত্য চট্টগ্রামে ঐতিহ্যবাহী ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সংক্রান্ত ধারণা ও সুদৃঢ়করণ প্রকল্প' উদ্বোধন করা হয় গত ১৫ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়ির খাগড়াপুর মিলনায়তনে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। এআরডি'র বাস্তবায়নে ও অসএইড এর অর্থায়নে এই প্রকল্প জাবারাং কল্যাণ সমিতি খাগড়াছড়ি জেলার ৫টি উপজেলায় ২২টি কর্মশালা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কাজ করবে। এই প্রকল্প উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাবারাং কল্যাণ সমিতির সভাপতি সুচরিতা রোয়াজা। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য সুধাসিন্ধু খীসা, জাফর আহমদ, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, খাগড়াছড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান মংক্যচিং চৌধুরী, হংসধ্বজ চাকমা ও প্রবীন ত্রিপুরা। প্রকল্প বিষয়ে মূল আলোচনা করেন জাবারাং কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মথুরা ত্রিপুরা। এতে আরও বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট হেডম্যান ও জাবারাং কল্যাণ সমিতির উপদেষ্টা শক্তিপদ ত্রিপুরা, হেডম্যান এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী সুইহ্লা প্রু চৌধুরী ও ইউপি চেয়ারম্যান পরিতোষ চাকমা প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বলেন যে, এই প্রকল্পটি জটিল অথচ গুরুত্বপূর্ণ। যারা এই প্রকল্প বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেবেন তাদেরকে দেশের ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা রাখতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, কার্বারী, হেডম্যান ও সার্কেল চীফের সমন্বয়ে আমাদের এখানে যে জাতীয় নেতৃত্ব বিদ্যমান তা আজকে অত্যন্ত সংকটময় ও দূর্বলতর অবস্থায় বিরাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। অনেক কার্বারী ও হেডম্যান সনাতনী ধারণায় দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু এটাকে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বিকাশ করতে হবে এবং সনাতনী ধারণা থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে তারা তাদের ক্ষমতাকে বিকশিত করবেন।

তিনি আরও বলেন যে, গ্রামের প্রধান হলো কার্বারী, মৌজার প্রধান হলেন হেডম্যান আর সার্কেলের প্রধান হলেন সার্কেল চীফ। তাদের তিনের দ্বারা গঠিত ঐতিহ্যবাহী নেতৃত্ব। এই ঐতিহ্যবাহী নেতৃত্ব পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে খন্ডিত হতে হতে শাসনক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব, ক্ষমতা জটিলতর অবস্থায় রয়ে গেছে। ইতিমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। কিন্তু এই পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে ঐতিহ্যবাহী নেতৃত্ব তাদের ভূমিকা পালনে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে আসতে পারেনি। তিনি আরও বলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে তাদের অনেক দায়িত্ব-ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তাই এব্যাপারে কার্বারী, হেডম্যান ও সার্কেল চীফদের এগিয়ে আসতে হবে। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকজন পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকুরী, ব্যবসা ও বিভিন্ন সূত্রে এসে এখানকার জায়গাজমি ভোগ দখল করে নিচ্ছেন অথচ এব্যাপারে হেডম্যানরা নিজেদের কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করছেন না। তাই তিনি হেডম্যানদের প্রতি আহ্বান জানান যে, তারা যেন বিতর্কিত জমি থেকে খাজনা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী-বাঙালী স্থায়ী অধিবাসীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন করে এবং চুক্তি ও আইন লংঘন করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসকগণ অবৈধ স্থায়ী বাসিন্দার সার্টিফিকেট প্রদান করে চলেছে। আমরা সরকারকে বলতে চাই যে, যেদিন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত হবে সে ধরনের সকল সার্টিফিকেট বাতিল বলে ঘোষণা দেয়া হবে। আমি আশা করবো ডিসি সাহেবরা সে ধরণের সার্টিফিকেট প্রদান থেকে বিরত থাকবেন।

সংখ্যালঘুদের সংগ্রাম অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে হবে - উষাতন তালুকদার

বাংলাদেশের ধর্মীয় ও জাতীয় সংখ্যালঘুদের স্বাধিকার ও নিরাপত্তার জন্য অব্যাহতভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। দেশের গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও মানবতাবাদী শক্তির সাথে একাত্ম হয়ে সংখ্যালঘুদের এই আন্দোলন ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে নিতে হবে। গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৩ ঢাকায় খৃষ্টান চার্চ কমিউনিটি সেন্টারে বোধিপাল মহাথেরোর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাজনৈতিক বিষয়ক সম্পাদক উষাতন তালুকদার একথা বলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বানচাল এবং জুম্ম জনগণসহ সংখ্যালঘুদের চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে মহালছড়িতে জুম্মদের উপর সেনাবাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় সেটেলারদের সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো হয়েছে বলের তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

সভায় দেশের বর্তমান অবস্থা, সংখ্যালঘুদের অবস্থা বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও মহালছড়ি ঘটনা নিয়েও আলোচনা করা হয়। আলোচনা শেষে মার্চ ২০০৪ সালে সংগঠনের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য প্রমোদ মানখিন এমপিকে আহ্বায়ক, উষাতন তালুকদারকে যুগ্ম আহ্বায়ক ও নির্মল রোজারিওকে সদস্যসচিব করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়। তাছাড়া বিভিন্ন উপকমিটিও গঠন করা হয়। জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, যে দল অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল, দেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা প্রদান এবং সংখ্যালঘুর জন্য আসন সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে অধিকতর এগিয়ে আসবে সে দলকে সমর্থন জানানো হবে। তাছাড়া সংখ্যালঘুরা স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করারও সিদ্ধান্ত হয়। এজন্য বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষ ও রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণের ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নেপালে নিয়োজিত সাবেক রাষ্ট্রদূত শিরিল শিকদার, এডভোকেট হিমাংশু বিমল হাওলাদার, এডভোকেট রানা দাশগুপ্ত প্রমুখ।

লংগদুতে সেটেলার চেয়ারম্যান কর্তৃক এক জুম্মর রেকর্ডভুক্ত জমি বেদখলের অপচেষ্টা

সম্প্রতি রাঙামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলার ৫নং ভাসন্যা আদাম ইউনিয়নের ঘনমোর এলাকার অধিবাসী কংসরাজ চাকমা পীং-তিলমোহন চাকমার রেকর্ডভুক্ত ৩ একর পরিমান গ্রোভল্যান্ড জমি অত্র ইউনিয়নের সেটেলার চেয়ারম্যান মো: তোফাজ্জল হোসেন পীং- মমতাজ ব্যাপারী কর্তৃক জবরদখলের অপচেষ্টা প্রায় সম্পন্ন হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কংসরাজ চাকমার জমিটি ১৯৬৬ সালে বন্দোবস্তীকৃত; যার খতিয়ান নং- আর-২২। এ রিপোর্ট পাওয়া পর্যন্ত উক্ত সেটেলার চেয়ারম্যান প্রকৃত মালিকের প্রতিবাদ উপেক্ষা করে গ্রোভল্যান্ডটিতে আমের চারা লাগানোর জন্য গর্ত করেছে এবং গোবরসার প্রয়োগ করেছে বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, উক্ত সেটেলার চেয়ারম্যান যখন জমিটি বেদখলের তৎপরতা শুরু করে তখন কংসরাজ চাকমা চেয়ারম্যানের নিকট বিনয়ের সাথে জানতে চায় যে, সবকিছু জেনে শুনে কেন সে এভাবে জমিটি বেদখলের চেষ্টা করছে। জবাবে চেয়ারম্যান বলে যে, সবকিছু জেনে শুনেই সে এমন করছে এবং জমিটি তার চায়। এদিকে নিরুপায় কংসরাজ চাকমা এ ব্যাপারে স্থানীয় আর্মি ক্যাম্প কমান্ডার নায়েক সুবেদার মাহবুবুর রহমানের কাছে নালিশ করলে সেই কমান্ডারের জবাব হচ্ছে- 'ভূমি বিষয়ে তাদের করার কিছু নেই; মারামারি-কাটাকাটি হলে কিংবা জায়গা-জমি ভাগাভাগির ক্ষেত্রে তাদের করার কিছু থাকে বলে জানায় সে।'

উল্লেখ্য, গত বছরও জনৈক সেটেলার উক্ত জমিতে জোরপূর্বক জুমচাষ এবং কলাগাছ রোপণ শুরু করলে কংসরাজ প্রবল আপত্তি জানায়। এতে একজন ইউপি সদস্য আমীর হোসেন সমস্যাটি এভাবে নিষ্পত্তি করে দেয় যে, সেবারের মত সেটেলারটি জমির ধান পাবে এবং কলাগাছের ফলও সে পাবে। আর ধান ও কলাগাছের ফাঁকে ফাঁকে মালিক কংসরাজ জমিতে আম ও কাঠালের চারা রোপণ করতে পারবে। সে অনুসারে কংসরাজ গত বছর ৫ / ৬ শত আম ও কাঠাল চারা রোপন করে এবং সমসংখ্যক সেগুন চারাও রোপণ করে। কিন্তু এবার উক্ত সেটেলার চেয়ারম্যান তোফাজ্জল কংসরাজের রোপণ করা সব চারা ধ্বংস করে দিয়েছে এবং তার জায়গায় জোরপূর্বক নিজস্ব চারা রোপণ করে জমিটি বেদখল করে নিয়েছে।

লংগদুতে এক আর্মি কমান্ডারের অদ্ভুত বিচারকার্য

সম্প্রতি রাঙামাটি জেলাধীন লংগদুতে জনৈক এক আর্মি কমান্ডার কর্তৃক এক অদ্ভুত বিচারকার্য সম্পন্ন হয়েছে। বিচারের রায় হচ্ছে- সেনা সদস্যদের কর্তৃক ফসল নষ্ট করেও মালিককে ফসল নষ্ট হয়নি বলে স্বীকারপত্র প্রদান করা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ২ আগষ্ট ২০০৩ লংগদু জোন ১৬ ই বি আর এর জনৈক কমান্ডারের নেতৃত্বে একটি সেনা দল ৭নং লংগদু ইউনিয়নের দাদীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়। সেনারা সেখানে থাকার জন্য স্কুল সংলগ্ন ধান ও হলুদ ক্ষেতের উপর বিভিন্ন স্থানে মাটি খুঁড়ে থাকার ব্যবস্থা করে। এর একদিন পর ৪ আগষ্ট ২০০৩ সকাল প্রায় ৯ টায় উক্ত কমান্ডার স্থানীয়

ইউপি সদস্য বারেন্দ্র চাকমা (৪০) পীং- তেজেন্দ্র লাল চাকমা ও স্থানীয় কার্বারী প্রিয় লাল চাকমা (৩২) পীং- কৃতি লাল চাকমাকে স্কুলে ডেকে পাঠায়। এরপর ইউপি সদস্য বারেন্দ্র চাকমা ও কার্বারী প্রিয় লাল চাকমা স্কুলে অবস্থানরত আর্মি কমান্ডারের কাছে গেলে কমান্ডার দুটো লিখিত কাগজ বের করে এবং ইউপি সদস্য ও কার্বারীকে উক্ত কাগজে স্বাক্ষর করতে বলে। ইউপি সদস্য বারেন্দ্র চাকমা কাগজ দুটো পড়ে দেখেন যে, আসলে কাগজ দুটো হচ্ছে- আর্মি কর্তৃক যে সমস্ত ফসলাদি নষ্ট হয়েছে সে সমস্ত কোন কিছুই নষ্ট/ক্ষতি হয়নি মর্মে স্বীকারপত্র। ফসলের কতটুকু ক্ষতি হয়েছে তা না দেখে কাগজে দস্তখত করতে পারবেনা বলে ইউপি সদস্য কমান্ডারকে জানিয়ে দেয়। এরপরই ইউপি সদস্য ও কার্বারী পার্শ্ববর্তী ঘটনাস্থলে সরেজমিনে দেখেন যে, প্রকৃতপক্ষে ফসলের অনেক ক্ষতি হয়েছে। এসে তারা কমান্ডারকে বলেন যে, 'স্যার, আপনার তো বিবেক আছে, বিচার আছে। ফসলাদি অনেক নষ্ট হয়েছে। আপনিই বিচার করুন।' প্রত্যুত্তরে কমান্ডার বলে যে, এখানে কি সরকারীভাবে জমির মালিকের কোন বন্দোবস্ত আছে? আমি বিচার করতে পারবোনা, আপনি বিচার করেন। জবাবে ইউপি সদস্য বলে যে, যেহেতু জমির মালিক আমি নই, তাই বিচারও করতে পারবোনা, দস্তখতও করতে পারবো না। জবাবে কমান্ডার বলে যে, আপনি ইউপি সদস্য হলেন কেন? আপনাকে কে বা কারা ভোট দিয়েছে? জমির বিচার করতে পারেন না, এই বিচার সেই বিচার করতে পারেন না। ইউপি সদস্য জমির মালিকের সাথে বোঝাপড়ার পরামর্শ দিলে কমান্ডার জমির মালিককে ডাকতে বলেন। জমির মালিক ধন বিন্দু চাকমা (২৫) তার জমিসংক্রান্তকাগজপত্র নিয়ে আসেন। এরপর যখন কমান্ডারের আর কিছুই বলার থাকে না তখন শেষ পর্যন্ত তিনি জোর করে মালিকের নিকট থেকে দস্তখত আদায় করেন।

লংগদু থেকে ইউপিডিএফ এক জুম্মকে অপহরণ করেছে

৪ আগষ্ট ২০০৩ সকাল প্রায় সাড়ে ৮ টার দিকে রাঙামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলার হাড়িকাবা এলাকা থেকে চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা নোয়ারাম চাকমা (৫০) পীং- সম কুমার চাকমাকে নিজ বাড়ী থেকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। এছাড়া অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময় ঘরবাড়ীও জ্বালিয়ে দিয়ে যায়। এই অপহরণকারীদের দলে চুক্তি বিরোধীদের চিহ্নিত সন্ত্রাসী আনন্দ প্রকাশ চাকমা নেতৃত্ব দেয় বলে জানা গেছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অপহৃত নোয়ারামের মুক্তির খবর পাওয়া যায়নি।

বাঘাইছড়িতে ইউপিডিএফ কর্তৃক ১ জন নিহত এবং অপর ১ জন প্রহৃত

৪ আগষ্ট ২০০৩ চুক্তি বিরোধী সন্ত্রাসী ইউপিডিএফ এর সশস্ত্র সদস্যরা রাঙামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার ৩৬ নং সাজেক ইউনিয়নের দুরদুরিছড়া গ্রামের বাসিন্দা প্রিয়ময় কার্বারী (৪৩) পীং- মৃত বিনোদ বিহারী চাকমাকে নিজ বাড়ী হতে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরে চুক্তির সমর্থক হওয়ায় চুক্তি বিরোধীরা অপহৃত প্রিয়ময় কার্বারীকে হত্যা করে। অপরদিকে গত ৫ আগষ্ট ২০০৩ একই উপজেলার বঙ্গলতলী বি-ব্লক গ্রামের নিরীহ প্রদীপ চাকমা পীং-মৃত কৃষ্ণ মোহন চাকমাকে মাচালং বাজারে ধরে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা বেদম প্রহার করে এবং প্রহারের পর ৬৭০০/-টাকার বিনিময়ে তাকে ছেড়ে দেয়।

নানিয়ারচরে ইউপিডিএফ এর সশস্ত্র সদস্যদের কর্তৃক গবাদি পশু লুট

৫ আগষ্ট ২০০৩ রাঙামাটি জেলার নানিয়ারচর উপজেলার দুই জুম্ম পরিবার হতে চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ এর সশস্ত্র সদস্যরা অস্ত্রের মুখে গবাদি পশু লুট করে নিয়ে গেছে। উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা (ইমন) ও ভাস্কর চাকমা চুক্তি বিরোধীদের এই দলে নেতৃত্ব দেয় বলে জানা গেছে। যাদের কাছ থেকে গবাদি পশু নিয়ে যাওয়া হয় তারা হল- ১. নিবারন চাকমা (৪৫) পীং- নীলমনি চাকমা, গ্রাম- টেঙাছড়ি, নানিয়ারচর ও ২. নীলকান্ত চাকমা (৬৫) পীং- অজ্ঞাত, গ্রাম- আগুনদিয়া চুক, নানিয়ারচর। নিবারন চাকমার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হয় ৪টি মহিষ, আর নীলকান্ত চাকমার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হয় হালের বলদ ৪টি। লুট করা এই গবাদি পশু গুলো চুক্তি বিরোধীরা পরে কাউখালীর বর্মাছড়িতে নিয়ে বিক্রি করেছে মালিকরা জানিয়েছে।

ঘাগড়ায় সেনা সদস্যদের কর্তৃক ৩ নিরীহ জুম্ম গ্রেফতার

১৫ আগষ্ট ২০০৩ সকাল ১০টায় ঘাগড়া জোনের সেনা সদস্যরা ঘাগড়া চেকপোষ্টে লাইসেন্সধারী বন্দুকসহ তিন নিরীহ জুম্মকে গ্রেফতার করেছে। এ সময় তারা শিকারের উদ্দেশ্যে বেবী টেক্সিতে করে যাচ্ছিল। পরে সেনাসদস্যরা তাদেরকে কাউখালী থানার পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। সেনা কর্তৃপক্ষ প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করে পুলিশকে উক্ত তিনজনের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা নিতে বাধ্য করে। গ্রেফতারকৃতরা হল- ১. প্রশান্ত কুমার চাকমা (৪৭), পীং-চিত্র মোহন চাকমা, গ্রাম- চৌধুরীপাড়া, ঘাগড়া; ২. তপন চাকমা (২৮), পীং- জয়বো চাকমা, গ্রাম- কলাবন্যা, কাউখালী; ৩. সুভাষ চাকমা (২৭), পীং- জয়সেন চাকমা, গ্রাম- চৌধুরীপাড়া, কাউখালী।

প্রথমে সেনাসদস্যরা আটককৃতদের কর্তৃক ভাড়া করা বেবী টেক্সিটি তল্লাশী করে। তারপর প্রশান্ত চাকমা ও তপন চাকমাকে গ্রেফতার করে, যারা লাইসেন্সধারী শান্তি মনি চাকমার ০.২২ রাইফেল বহন করছিল। উলেখ্য যে, শান্তি মনি চাকমা ঘাগড়া ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, যিনি তার বন্দুকটি তপন চাকমাকে বহন করতে দেন। সেনা সদস্যরা যখন তাদেরকে গ্রেফতার করছিল এসময় তারা বন্দুকের লাইসেন্সও প্রদর্শন করে।

রাঙামাটিতে এক ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার

১৬ আগষ্ট ২০০৩ রাঙামাটি সদরের কোতয়ালী থানা পুলিশ শহরের নিউ মার্কেট এলাকায় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতা নিকো চাকমাকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী হিসেবে অভিযোগে নিকোকে গ্রেফতার করে। কিন্তু সে তার উপর সাজানো মিথ্যা মামলায় জামিনে ছিল। তাই পরে পুলিশ তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

আলীকদমে মৎস্য চাষের নামে ২০টি মুরং পরিবার উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র

সম্প্রতি বান্দরবান জেলাধীন আলীকদম উপজেলায় স্থানীয় সরকারী সংস্থা কর্তৃক মৎস্য চাষের নামে বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনায় চিওনী পাড়ার ২০টি আদিবাসী মুরং পরিবার উচ্ছেদের মুখে পড়েছে এবং এতে মুরংদের প্রায় ১৫ একর কৃষিজমি জলমগ্ন হবে। জানা যায়, কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহলের প্ররোচনায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন বোর্ডের তত্বাবধানে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অর্থায়নে চিওনী পাড়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত এ্যংখ্যং ঝিরিতে মৎস্য চাষের নামে এই অবিবেচক বাঁধ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়। এই উদ্যোগের পরপরই স্থানীয়ভাবে তা বন্ধ করার জন্য দাবী জানানো হয়। কিন্তু তারপরও এই বাঁধ নির্মাণের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। ফলে গত ৩০ জুলাই ২০০৩ ক্ষতির সম্মুখীন মুরং পরিবারের পক্ষ থেকে উক্ত চক্রান্তমূলক উদ্যোগ বন্ধের দাবী জানিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানের বরাবরে একটি স্মারকলিপিও প্রেরন করা হয়েছে। স্মারকলিপিতে স্থানীয় কয়েকজন বাঙালী প্রতিনিধিও একাত্মতা প্রকাশ করে স্বাক্ষর প্রদানে সামিল হয়েছে। কিন্তু এরপরও এপর্যন্ত এব্যাপারে কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ দেখা না যাওয়ায় মুরংদের মাঝে হতাশা ও ক্ষোভ বিরাজ করছে।

নানিয়ারচরের রামহরিপাড়া ও কৃষ্ণমাছড়ায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের হামলা, অগ্নিসংযোগ

২৩ আগষ্ট ২০০৩ সকাল ১০টার দিকে কানুনগো বিকাশ চাকমা (৩৭) ও রয়েল মারমা (৪০)-র নেতৃত্বে ইউএফডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা নানিয়ারচর উপজেলাধীন ঘিলাছড়ি ইউনিয়নের রামহরি পাড়া ও কৃষ্ণমাছড়ায় হামলা চালিয়ে ১০টি বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করেছে এবং ১৪ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে অপহরণ করেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায় যে, সেদিন ভোর বেলায় ইউপিডিএফ-এর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা প্রথমে কৃষ্ণমাছড়া গ্রামের কালীমোহন চাকমার বাড়ীতে হামলা চালায়। এসময় কালী মোহন চাকমার স্ত্রী মিনতি চাকমা বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। প্রথমে বাড়ীটি চারিদিক থেকে ঘেরাও করার পর বন্দুক তাক করে বাড়ীর ভেতর থেকে সকলকে বেরিয়ে আসতে নির্দেশ দেয় এবং সাথে সাথে বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। কালীমোহন চাকমার স্ত্রী বাড়ীর জিনিষপত্র বের করার চেষ্টা করলে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা তাকে গুলি করে হত্যা করার হুমকি দেয়। এরপর তারা কৃষ্ণমাছড়ায় আরো ৪টি বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। এসময়ে মহিলারা বাড়ীঘর হতে তাদের জিনিসপত্র বের করার চেষ্টা করলে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা তাদেরকে মারধর করে। এ সময় সন্ত্রাসীদের প্রহারে সাবানা চাকমা পীং-নতুন চন্দ্র চাকমা নামের এক যুবতী মারাত্মকভাবে আহত হয়। তাদের তান্ডবলীলা চলার এক পর্যায়ে বীর রঞ্জন চাকমাকে মারধর করতে করতে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অবশেষে কৃষ্ণমাছড়া থেকে ১ জন এবং রামহরি পাড়া থেকে ১৩ জনকে অপহরণ করে চলে যায়। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সন্ত্রাসীরা কাউকে ছেড়ে দিয়েছে বলে জানা যায়নি।

জানা গেছে, কিছুদিন থেকে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা রামহরি পাড়া গ্রামবাসী থেকে ১,৫০,০০০ টাকা, কৃষ্ণমাছড়া গ্রামবাসী থেকে ১,৩০,০০০ টাকা, সয়ন্তর পাড়া গ্রামবাসী থেকে ৫০,০০০ টাকা, শিওল্যা পাড়া গ্রামবাসী থেকে ৭০,০০০ টাকা, তৈচাগুমা পাড়া গ্রামবাসী থেকে ৫০,০০০ টাকা এবং মাইচছড়ি পাড়া গ্রামবাসী থেকে ৭০,০০০ টাকা চাঁদা দাবী করে আসছিল। গ্রামবাসীরা উক্ত পরিমাণ টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা গণহারে অপহরণ ও বাড়ীঘরে অগ্নিসংযোগ করেছে বলে গ্রামবাসীরা জানিয়েছে। হামলার ভয়ে উক্ত গ্রামসমূহের গ্রামবাসীরা বর্তমানে রাঙামাটি সদরের বিভিন্ন এলাকায় এসে আশ্রয় নিয়েছে বলে জানা গেছে। যাদের ঘরবাড়ী সম্পূর্ণ ভস্মিভূত হয় -

১। কালীমোহন চাকমা, ৪৫, পীং বড়মুও চাকমা, কৃষ্ণমাছড়া;
২। কর্মফল চাকমা, ৬০, পীং অমাবস্যা চাকমা, কৃষ্ণমাছড়া;
৩। সুব্রত চাকমা সপ্যা, ৩৫, পীং খগেন্দ্র মাস্টার, কৃষ্ণমাছড়া;

৪। ভাগ্যফল চাকমা, ৪৫, পীং বিজুধন চাকমা, কৃষ্ণমাছড়া;
৫। শান্তিপূর্ণ চাকমা, ৫০, পীং পবিত্র কার্বারী, কৃষ্ণমাছড়া;
৬। কণিকা কুমার চাকমা, ২৮, পীং বুদ্ধমনি চাকমা, রামহরি পাড়া;
৭। মনিয়া চাকমা, ৩০, পীং রাজেন্দ্র চাকমা, রামহরি পাড়া;
৮। শান্তিরঞ্জন চাকমা, ২৬, পীং লোচন চাকমা, রামহরি পাড়া;
৯। রেবতী মোহন চাকমা, ৪৫, পীং মথুরানাথ চাকমা, রামহরি পাড়া;
১০। কারনচন্দ্র চাকমা, ৬২, পীং ভ্রজেন্দ্র লাল চাকমা, রামহরি পাড়া।

যাদেরকে অপহরণ করা হয় -

১। অম্বিকারঞ্জন চাকমা, ৩৬, পীং লালনচন্দ্র চাকমা, রামহরি পাড়া;
২। দেবেন্দ্র লাল চাকমা, ৩৫, পীং তারাচান চাকমা, রামহরি পাড়া;
৩। প্রিয় কুমার চাকমা, ৪৫, পীং উমেশ চন্দ্র চাকমা, রামহরি পাড়া;
৪। বীর কুমার চাকমা, ৬৫, পীং রবি কান্ত চাকমা, রামহরি পাড়া;
৫। তাপস চাকমা, ২৫, পীং কারনচন্দ্র চাকমা, রামহরি পাড়া;
৬। রেবতী চাকমা, ১৮, পীং মথুরানাথ চাকমা, রামহরি পাড়া;
৭। অনুপম খীসা, ১৮, পীং হরিকমল খীসা, রামহরি পাড়া;
৮। আনন্দ বিহারী চাকমা, ৫৫, পীং চারুধন চাকমা, রামহরি পাড়া;
৯। লতিপ চাকমা, ২৩, পীং নতুন চন্দ্র চাকমা, রামহরি পাড়া;
১০। নতুন চন্দ্র চাকমা, ৫৭, পীং চন্দ্র কুমার চাকমা, রামহরি পাড়া;
১১। প্রতিপদ চাকমা, ৫৭, পীং ইন্দ্র কুমার চাকমা, রামহরি পাড়া;
১২। সুভাষবসু চাকমা, ৩০, পীং আনন্দ কুমার চাকমা, রামহরি পাড়া;
১৩। মুড়াশিং চাকমা, ৬১, পীং শ্যামকান্ত চাকমা, রামহরি পাড়া;
১৪। বীর রঞ্জন চাকমা মুদো, ৩৫, পীং নিকুঞ্জ বিহারী চাকমা, কৃষ্ণমাছড়া।

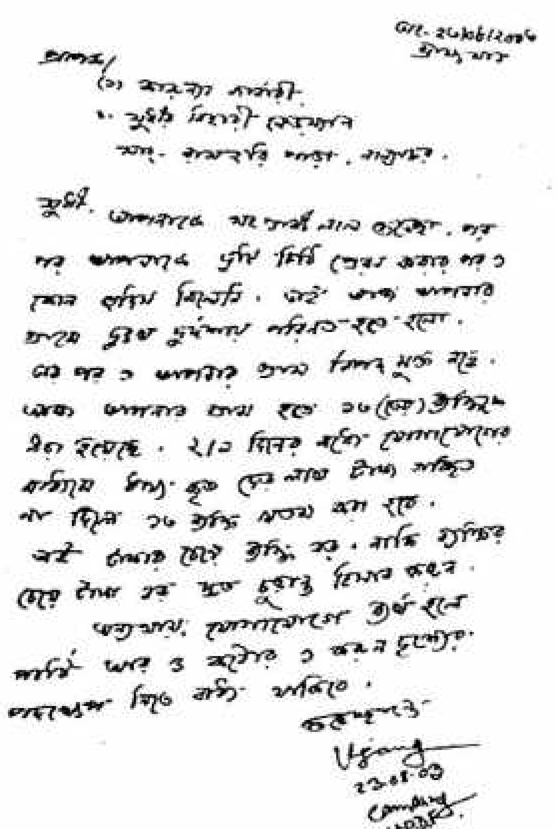

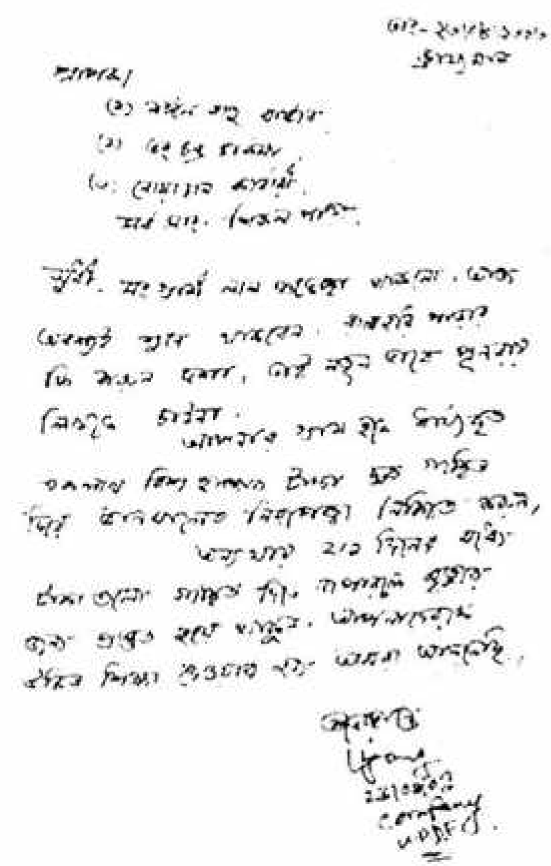

ইউপিডিএফ'র গুলীতে কাউখালীতে জেএসএস সদস্য নিহত

২৫ আগষ্ট ২০০৩ ইউপিডিএফ এর একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী রাঙামাটি জেলাধীন কাউখালী উপজেলা সদরে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্য কৃষ্ণ শংকর চাকমা (৩৮), গ্রাম- বেতছড়ি, কাউখালীকে গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, এদিন ছিল কাউখালী বাজারের হাটের দিন। যথারীতি সকালে বাজারে গিয়ে কৃষ্ণশংকর চাকমা বাড়ীতে ফিরছিলেন। ফেরার পথে সকাল প্রায় ৯.০০ টায় কাউখালী সেতু পার হওয়ার পরই সন্ত্রাসীরা কৃষ্ণশংকর চাকমাকে লক্ষ্য করে গুলি করে। মাথায় গুলি বিদ্ধ হলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। আচমকা গুলির আওয়াজ শুনলে বাজারে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং লোকজন ভয়ে দিক-বিদিক পালিয়ে যায়।

নিহত কৃষ্ণ শংকর চাকমার ৫ বছর ও ৪ মাস বয়সের দুটি শিশু সন্তান রয়েছে। এই নির্মম হত্যাকান্ডের ফলে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কৃষ্ণ শংকর চাকমাসহ ইউপিডিএফের হামলায় এযাবৎ কাউখালী এলাকায় জনসংহতি সমিতির ৫ জন সদস্য ও সমর্থক নিহত হলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

৩১ আগষ্ট ২০০৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোঃ মোশারফ হোসেন এমপি'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ-মন্ত্রী এমপি মণিস্বপন দেওয়ান, শাহজাহান চৌধুরী, এমপি (কক্সবাজার-৪), মুফতি মোওনালা আবদুস সাত্তার আখন্দ, এমপি (বাগেরহাট-৪), গাজী মোঃ শাহজাহান, এমপি (চট্টগ্রাম-১১), সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, এমপি (বরিশাল-২), মোস্তফা কামাল পাশা, এমপি (চট্টগ্রাম-৩) এবং আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া, এমপি (খাগড়াছড়ি) প্রমুখ সাংসদগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় একপর্যায়ে মহালছড়িতে সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় সেটেলার বাঙ্গালী কর্তৃক জুম্ম বসতির উপর সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলার কথা উত্থাপিত হয়। এ সময় আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া বলেন যে, উক্ত ঘটনা পাহাড়ীদের দ্বারা সংঘটিত করা হয়েছে, পাহাড়ীরাই নিজেদের ঘরবাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করেছে। ওয়াদুদ ভূঁইয়ার উক্ত বক্তব্যের পরে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপ-মন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে, এটা পাহাড়ীরা করে নাই। এটা সেটেলার বাঙ্গালীরাই সংঘটিত করেছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ২ দিন পর্যন্ত তিনি কিছুই জানতেন না। পত্রিকা পড়ে তিনি ঘটনা সম্পর্কে জেনেছেন। খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক হুমায়ুন কবীর খান বা পুলিশ সুপার মতিউর রহমান শেখ কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেননি। কেন সেখানে এই সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটল এবং কিভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করা যায় তা খতিয়ে দেখতে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি মহালছড়ি পরিদর্শনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পরও সেনাবাহিনীর শান্তকরণ প্রকল্প অব্যাহত থাকা এবং উক্ত প্রকল্পের হিসাবের দায়বদ্ধতা না থাকার বিষয়ে বৈঠকে প্রশ্ন উঠে। বিশেষ করে বরিশাল থেকে নির্বাচিত সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং অবশ্যই সেনাবাহিনীর জবাবদিহিতা দিতে হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন বলে জানা যায়।

খাস জমির বিবরণ প্রদানের জন্য হেডম্যানদের নির্দেশ

খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলার রাজস্ব অফিসার (ভূমি) অরবিন্দ মজুমদার দীঘিনালা উপজেলার বিভিন্ন হেডম্যানদের কাছে ৩১/৮/২০০৩ তারিখে এই মর্মে নির্দেশমূলক চিঠি দিয়েছেন যে, ২৫/৯/২০০৩ এর মধ্যে খাসজমিতে অবস্থানকারীর নাম, ভূমির পরিমাণ ও জমির অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। যেসব মৌজার হেডম্যানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেসব মৌজাগুলো হলো (১) ৩৪ নং চাতারাছড়া (২) ৩৬ নং ঢুকিছড়া (৩) ৩৭ নং সার্দ্দেংছড়া (৪) ৪৬ নং ধনপাতা (৫) ৪৭ নং মধ্য ধনপাতা ও (৬) ৪৮ নং ডানে ধনপাতা মৌজা। চিঠিতে বলা হয় যে, এসকল মৌজায় খাজনা ও কর আদায়ের পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য অথচ মৌজার ভূমি রেজিস্টারে প্রচুর খাস জমি রয়েছে।

হেডম্যানরা এ নির্দেশ পাওয়ার পর ক্ষুব্দ হয়েছেন বলে জানা যায়। কেননা একদিকে সরকারী নিষেধাজ্ঞার কারণে ভূমি বন্দোবস্তী প্রদান বন্ধ রয়েছে আবার হেডম্যানদের সম্মতি ব্যতিরেকে সেটেলার বাঙালীদেরকে ভূমি বন্দোবস্তী প্রদান করা হয়েছে। তারা আশংকা প্রকাশ করছেন যে, খাস জমির অজুহাতে সরকার সেখানে নতুন করে বাঙালী সেটেলার বসতিস্থাপনের উদ্যোগ নেবে।

জননেতা তাপস ত্রিপুরাসহ চার ছাত্রনেতাকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে গ্রেফতার

৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩ চট্টগ্রাম মহানগরে পার্বত্য চুক্তি বিরোধী সন্ত্রাসী সংগঠন ইউপিডিএফ এর চক্রান্তে জনসংহতি সমিতির এক প্রতিনিধিসহ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের চার নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের বন্দর থানায় সাজানো মিথ্যা মামলা দিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মিথ্যা মামলায় গ্রেফতারকৃতরা হলেন- ১. তাপস ত্রিপুরা (৩২) পীং- নগেন্দ্র ত্রিপুরা, সাং- বাবুপাড়া, থানা- মাটিরাঙ্গা, জেলা- খাগড়াছড়ি, ২. বিমল কান্তি চাকমা পীং- সুরেশ কুমার চাকমা, সাং- ঠেগামুখ, থানা- বরকল, জেলা- রাঙামাটি, ৩. রন বিকাশ চাকমা (২০) পীং- .গাকুল চন্দ্র চাকমা, সাং- চান্দবী ঘাট, থানা- বরকল, জেলা- রাঙামাটি, ৪. কালোময় চাকমা পীং- বাদী মোহন চাকমা, সাং- বামের হাটছড়া, থানা- লংগদু, জেলা- রাঙামাটি, ৫. সুসময় চাকমা পীং- জড়ধন চাকমা, সাং- বেঙীছড়া, থানা- লংগদু, জেলা- রাঙামাটি। উল্লেখ্য, তারা সবাই ইতিমধ্যে চট্টগ্রামে অবস্থান করছিলেন। তাপস ত্রিপুরা জনসংহতি সমিতির একজন প্রতিনিধি হয়ে কাজ করছিলেন, আর অপর তিন জন মহানগরে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করছিলেন। অন্যায়ভাবে গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা নং-৮(৯)২০০৩, জি,আর, নং- ২২ / ০৩, ধারা- আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন ২০০৩ এর ২(খ) (অ) (১) এবং ৪ ধারা।

মিথ্যা মামলায় গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক চাঁদাবাজি ও ভয়ভীতি প্রদর্শণের মত কাল্পনিক অভিযোগ সাজানো হয়। অথচ প্রকৃত ঘটনা হল- চট্টগ্রাম মহানগরের পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে বিমল কান্তি চাকমাসহ কয়েকজন নেতা-কর্মী চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় জনসংযোগ করতে গেলে সেখানে উপস্থিত বেশকিছু চুক্তি বিরোধী তাদেরকে মারধর করতে উদ্যত হয়। এতে বিমল কান্তি চাকমা প্রতিবাদ করলে চুক্তি বিরোধীরা বিমলকে মারধর করে এবং চক্রান্ত করে মিথ্যা মামলা দিয়ে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। এদিকে চুক্তি বিরোধীদের কর্তৃক বিমলকে মারধরের খবর পেলে বিষয়টি দেখার জন্য পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কয়েকজন নেতা-কর্মীসহ তাপস ত্রিপুরা প্রথমে বন্দরের ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে উপস্থিত চুক্তি বিরোধীদের সাথে তাদেরও বাক-বিতন্ডা হয় এবং এক পর্যায়ে উভয়ের মধ্যে ধ্বস্তাধস্তি হয়। পরে বিমলকে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে জানলে তাপস ত্রিপুরা ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের অন্যান্যরা সেখানে যায়। এদিকে পুলিশের ওসি চুক্তি বিরোধীদের যোগসাজশে চক্রান্ত করে মামলার নামে মিথ্যা নাটক সাজিয়ে রাখে। ফলে তাপস ত্রিপুরা ও তার সঙ্গে অন্যান্যরা থানায় উপস্থিত হলে সেখানে অবস্থানরত চুক্তি বিরোধীরা তৎক্ষণাৎ তাপসদের দেখিয়ে দিয়ে পুলিশকে বলে যে, এই এরাও চাঁদা বাজি করেছে এবং ভয়ভীতি দেখিয়েছে। এদিকে তাপসরা পুলিশকে আসল ঘটনা বুঝিয়ে বলার আগেই পুলিশ তাপস ত্রিপুরাসহ অন্যান্যদের সেখানেই গ্রেফতার করে বসে।

চুক্তি বিরোধীদের পক্ষে মিথ্যা অভিযোগকারী ও মিথ্যা মামলা দায়েরকারীর নাম হচ্ছে- রিন্টু চাকমা পীং- মৃত রেমন চাকমা, সাং- বটবিল পাড়া, থানা- নানিয়ারচর, জেলা- রাঙামাটি। উল্লেখ্য, রিন্টু চাকমা বেশ কিছুদিন ধরে চট্টগ্রামের বন্দর এলাকায় চুক্তি বিরোধীদের হয়ে তথাকথিত সাংগঠনিক কাজ ও ভয় দেখিয়ে চাঁদাবাজি করছিল। ইতিমধ্যে সে রাঙামাটি জেলার বন্দুকভাঙা, নানিয়ারচর, কুতুকছড়ি ইত্যাদি এলাকায় চুক্তি বিরোধীদের সশস্ত্র ক্যাডার তথা সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িত ছিল। এই রিন্টু চাকমা রিন্টু ছাড়াও রিংকু, জেমস ইত্যাদি নামেও পরিচিত। যা মামলার সময় চট্টগ্রাম আদালতেও সে স্বীকার করে বলে জানা যায়। আর বর্তমানে সে 'জেমস' নামে চট্টগ্রামের ইপিজেড-এ চাকুরী করছে। অপরদিকে রিংকু চাকমা নামে রাঙামাটিতে তার বিরুদ্ধে অপহরণ ও চাঁদাবাজির মামলা রয়েছে বলে জানা যায়।

চাঁদার দাবীতে ইউপিডিএফ-এর চিঠি

কাউখালী উপজেলায় চাঁদার দাবীতে ইউপিডিএফ নতুন করে চিঠি দিতে শুরু করেছে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩ তারিখে গ্রামের কার্বারীর নিকট প্রেরিত চিঠিতে তারা গাছ বাঁশ কাটার উপরও নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে। এমনকি তাদের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গকারীকে গুলী করে হত্যা করা হবে বলেও হুমকী প্রদান করা হয়েছে। এই নিয়ে এলাকায় চরম উত্তেজনা ও নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করছে।

ইউপিডিএফ একটি বাড়ী ভস্মীভূত করে দিয়েছে

১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩ রোজ মঙ্গলবার সকাল ৮ টায় নানিয়ারচর থানাধীন শিকলপাড়ায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা একটি বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত করে দিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নাম- ভঙ্গচন্দ্র চাকমা, ৫০। তার দুটি ছেলে চুক্তির পক্ষে সমর্থন করে বলে সন্ত্রাসীরা তার বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। সন্ত্রাসীরা আগুন লাগানোর পর দ্রুত স্থান ত্যাগ করে বলে জানা গেছে।

ইউপিডিএফ সদস্য কর্তৃক জুম্ম নারী ধর্ষণ

১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩ ইউপিডিএফ সদস্য অনুপম চাকমা, পীং- হককুয়া চাকমা, সাং-রামসুপারী পাড়া কর্তৃক নানিয়ারচরের হাজাছড়া পাড়ার গর্ভবতী মহিলা বিমল শশী চাকমা (স্বামী- সুভাষ চাকমা) ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, ইউপিডিএফ সদস্য অনুপম চাকমা তৈচাকমা গ্রামস্থ হাজাছড়া পাড়ায় সদলবলে উপস্থিত হয়ে এই নারকীয় ও জঘন্য কাজটি করেছে। বিমল শশী চাকমাকে ধর্ষণের সময় তার অসহায় মা-বাবা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। রাঙামাটিতে ডাক্তারের নিকট বিমলশশী চাকমাকে আনা হলে তার পেটের সন্তান নষ্ট হতে পারে বলে ডাক্তাররা জানিয়েছেন। বর্তমানে বিমলশশী চাকমা রাঙামাটিতে অসহায়ভাবে দিনাতিপাত করছে।

রুমা সেনানিবাসের জন্য হাজার হাজার একর ভূমি অধিগ্রহণ

বনায়ন, প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নের নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বেদখল একটি সরকারী বৈষম্যমূলক প্রক্রিয়া। সামরিকায়নের পাশাপাশি ভূমি বেদখলের জন্য ক্যাম্প ও ক্যান্টনমেন্ট স্থাপন করে সামরিকবাহিনী ভূমি বেদখলের কাজে হাত পাকিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ৩টি ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে বান্দরবান পার্বত্য জেলার রুমা উপজেলায় রুমা ক্যান্টনমেন্ট সম্প্রসারণ করে ভূমি বেদখলের প্রক্রিয়াটি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। এজন্য ৯৫৬০ একর জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। এজন্য রুমা উপজেলার নির্বাহী অফিসার মতামত প্রেরণের জন্য ৩৬৬ নং সেংগুম মৌজার হেডম্যানকে স্মারক নং- উজেনিঅ/রুমা/ রাজস্ব/এক-১/২০০৩/২২৭ তারিখ ৩০/৮/২০০৩ মূলে একটি চিঠি দিয়েছে। এর আগে ২২/৪/০৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে বান্দরবান জেলার জেলা প্রশাসককে উক্ত পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ/ হস্তান্তর দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য আদেশ প্রদান করা হয়।

বিবরণে জানা যায় যে, ৩৬৪ ঘালেঙ্গা মৌজার ২৪৮০ একর, ৩৬৫ নং পানতলা মৌজার ৩৮০০ একর ও ৩৬৬ নং সেংগুম মৌজার ৩২৮০ একর ভূমি হুকুম দখলের জন্য ৮/৭/৮০ তারিখে জেলা ভূমি বরাদ্ধ কমিটির সভায় অনুমোদিত হয়। ভূমি বরাদ্ধ কমিটির সভায় পাস হবার পর তারা দেখতে পাই যে, এতে বেশীর ভাগ জমি খাস। তাই তা চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করা হয়। পরে রুমা ক্যান্টনমেন্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হতে তাগাদা দেওয়ায় ২৮/৯/৯২ উক্ত পরিমাণ ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব পুনঃ অনুমোদিত হয়। তারা দেখান যে, মাত্র ১৫ একর ভূমি ব্যক্তিমালিকানাধীন এবং তার ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারিত হয় ৬,০৯,৩৯৬.২৫ টাকা। রুমা ক্যান্টনমেন্ট কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকৃতি জানালে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম অসমাপ্ত থেকে যায়। পরে রুমা উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্মারক নং-রাজস্ব-১৫/১০/২৫৯, তাং-১৫/৮/৯১ মূলে জানান যে, রুমা ক্যান্টনমেন্ট স্থাপিত হলে ৬৫৫টি জুম্ম পরিবারের ৪৩১৫ জন জুম্ম ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ১৫৬৯.০৬ একর ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি ও ৪ হাজার একর বন বিভাগের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এর আলোকে রুমা ক্যান্টনমেন্ট কর্তৃপক্ষ ও বান্দরবান জেলার জেলা প্রশাসকের যৌথ তদন্ত করা হয়। যৌথ তদন্তে ৬৯১.৯৪ একর ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি ও ২ হাজার একর বন বিভাগের ভূমি ও ৪ শত জুম্ম পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে চিহ্নিত করা হয়। তাই নতুন করে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য বলা হয়। কিন্তু সেনাবাহিনী নাছোরবান্দা।

তারা আবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ৬/২/০৩ তারিখে এক পত্রের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে অবহিত করে। কেননা তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী এতে আপত্তি জানিয়েছিলেন। চিঠিতে আবার বলা হয় যে, ৯৫৬০ একরের ভূমির মধ্যে মাত্র ৫০ একর ভূমিতে জমি স্থাপনার উপযোগী এবং মাত্র ১৫ একর ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি রয়েছে। তাছাড়া জুম্মরা দীর্ঘদিন ধরে সরকারী খাসজমি ভোগ করে আসছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামত প্রদানের জন্য বলা হয়।

মাটিরাঙ্গায় নতুন সেনাক্যাম্প স্থাপিত

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার ১৯২ নং মাকুম তৈছা মৌজার গকুল মণি পাড়ায় নতুন করে সেনাক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এই ক্যাম্পের কাজের জন্য সেনা ক্যাম্প কমান্ডার হেডম্যান, কার্বারীদের বিনা মজুরীতে জুম্মদের শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করছে। তাছাড়া খেদাছড়া জোনের (১৪ ফিল্ড আর্টিলারী রেজিমেন্ট) কমান্ডারও এসকল কাজে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে বলে লোকজন জানিয়েছে। তাছাড়া ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা জোরপূর্বক গৃহপালিত পশুপাখি খেয়ে দিচ্ছে। সন্ত্রাসী তল্লাশীর নামে হয়রানি করে চলেছে। এসব অপকর্মে অতিষ্ট হয়ে এলাকার হেডম্যান, কার্বারীসহ ৯১ জন ব্যক্তি গণস্বাক্ষর দিয়ে ক্যাম্প প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছে। তারা এছাড়াও অবিলম্বে নতুন স্থাপিত সেনাক্যাম্প অপসারণ করা, জুম্মদের বিনা মজুরীতে কাজে খাটানো বন্ধ করা ও সন্ত্রাস দমনের নামে তাদের হয়রানি বন্ধ করার দাবী জানিয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৯ সালে এক ত্রিপুরা রমণীকে সেনাসদস্যরা ধর্ষণ করলে জনগণের চাপের মুখে তা প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

রেশন অব্যাহত রাখার দাবীতে প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের স্মারকলিপি ও সড়ক অবরোধ

সরকার কর্তৃক ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের রেশন প্রদান অব্যাহত রাখার দাবীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে খাগড়াছড়ি জেলায় ২৬-২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩ তিনদিন ব্যাপী সড়ক অবরোধ কর্মসূচী শান্তিপূর্ণভাবে পালন করা হয়। তাদের এই সড়ক অবরোধের প্রতি সমর্থন প্রদান করে যথাক্রমে খাগড়াছড়ি জেলা জনসংহতি সমিতি, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, যুব সমিতি, মহিলা সমিতি, হিল উইমেন্স ফেডারেশন প্রভৃতি সংগঠন। অবরোধের শেষ দিনে ২৮ সেপ্টেম্বর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের প্রাঙ্গণে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে শরণার্থী নেতৃবৃন্দ বক্তব্য প্রদান করার পর প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। নেতৃবৃন্দ তাদের দাবী আগামী ৭ অক্টোবরের মধ্যে পরিপূরণ করা না হলে কঠোর কর্মসূচী দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দেন।

উল্লেখ্য যে, রেশন প্রদান অব্যাহত রাখার দাবীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩ খাগড়াছড়িতে এক মৌন মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর নিকট সমিতির সভাপতি প্রভাকর চাকমা, সহ-সভাপতি মংসাপ্রু কার্বারী, সহ-সভাপতি হেমেন্দ্র ত্রিপুরা ও সাধারণ সম্পাদক সন্তোষিত চাকমা বকুল স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছিল।

গুচ্ছগ্রামের সেটেলারদের জন্য নতুন করে রেশন কার্ড বিলি

সরকার খাগড়াছড়ি জেলায় অবৈধভাবে বাসকারী গুচ্ছগ্রামের সেটেলারদের জন্য নতুন করে রেশন কার্ড ইস্যু করেছে। এদিকে জুম্ম শরণার্থীদের রেশন বন্ধ করা আর সেটেলার বাঙালীদের নতুন রেশন কার্ড ইস্যু করার মাধ্যমে সরকারের দ্বি-মুখী নীতির প্রতিফলন ঘটেছে। ১৯৭৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত সেটেলার বাঙালীদের রেশন প্রদান করা হয়ে আসছে এবং এসব রেশন নিয়ে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকতার দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। জানা গেছে ইতিমধ্যে আরও যেসকল নতুন সেটেলার খাগড়াছড়িতে বসতিস্থাপন করেছে তাদেরকে তালিকাভূক্ত করার জন্য এসব নতুন রেশন কার্ড বিলি করা হচ্ছে।

আর্মী ক্যাপ্টেনের নির্যাতন

১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩ বিকাল আনুমানিক ৫ ঘটিকার সময়ে রাজস্থলী সাবজোনের সেনাক্যাম্প কমান্ডার ক্যাপ্টেন নোমান (১ বেঙ্গল রেজিমেন্ট) সাদা পোষাক পরিহিত অবস্থায় রাজস্থলী বাজারে কয়েকজন জুম্মকে অমানবিকভাবে মারধর করেছে। মারধরের শিকার ব্যক্তিরা হলেন-(১) উত্তোলন তঞ্চঙ্গ্যা, মাগাইন পাড়া, ১নং ঘিলাছড়ি ইউপি। (২) বিপু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, কেপি এম-এর কর্মচারী। এছাড়া ২১/০৯/০৩ তারিখেও মোঃ সামশু ও নয়াঝিরি পাড়ার মং তঞ্চঙ্গ্যাকে মারধর করেছে। তারা বর্তমানে মারাত্মক আহত অবস্থায় ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছে। এছাড়া ক্যাপ্টেন কর্তৃক প্রহারকৃত উত্তোলন তঞ্চঙ্গ্যাকে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার করে রাঙ্গামাটি কোর্টে চালান দেওয়া হয়েছে। উক্ত ক্যাপ্টেনের এহেন কার্যকলাপে এলাকায় তীব্র জনরোষের সৃষ্টি হয়েছে।

লেমুছড়ি ত্রিরত্ন বৌদ্ধ বিহারের এই বুদ্ধ মূর্ত্তিটি আর্মিরা গভীর রাতে সরিয়ে নিয়েছিল

প্রচ্ছদের ছবি ঃ মহালছড়ি হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ীর একাংশ
খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ সমাবেশে সন্তু লারমা বক্তব্য রাখছেন

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৩ প্রকাশিত।

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ১৬.০০ টাকা

JUMMA SAMBAD BULLETIN

Newsletter of the Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti (PCJSS)
Issue no. 33, 12 th Year, Mahalchari Communal Attack Issue, 30 September 2003.
Published by Information and Publicity Department of PCJSS from its Central Office, Kalyanpur, Rangamati, Bangladesh. Phone : + 880-351-61248
E-mail: pcjss@hotmail.com

Price : TK. 16.00 only.